রেজি: ডিএ ৬০৫৮
সংখ্যা-২৩
শুক্রবার
০৪ আশ্বিন ১৪২১
২৩ জিলকদ ১৪৩৫
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৪৮ পৃষ্ঠা ২০ টাকা

সাপ্তাহিক সংকলন

সকল ধর্মের মর্ম কথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা

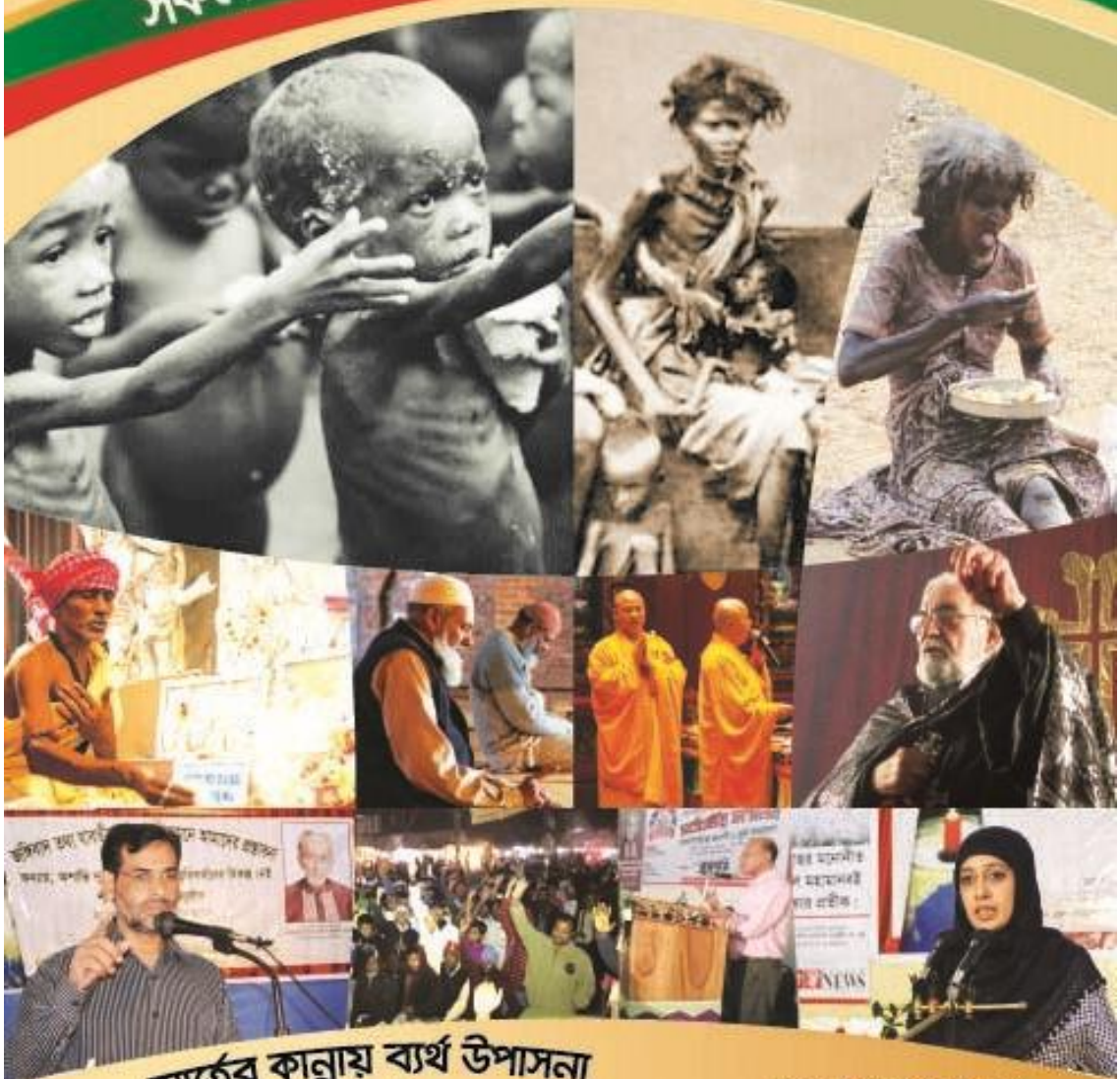

আর্তের কান্নায় ব্যর্থ উপাসনা
মুক্তির পথ নিয়ে ঐক্যের চেতনা

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ
দৈনিক দেশেরপত্র
Dainik Desherpotro

দৈনিক
দেশেরপত্র

সম্পাদকীয়

সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

সমগ্র মানবজাতি একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। সেই হিসাবে সকল মানুষ ভাই ভাই। এ বিষয়ে সকল ধর্মগ্রন্থই একমত। মানবসৃষ্টির পর থেকে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রসুল পৃথিবীতে এসেছেন, তারা সবাই একটি ধর্মই নিয়ে এসেছেন যার নাম সনাতন ধর্ম বা দীনুল কাইয়্যেমাহ। সনাতন শব্দের অর্থ হোল চিরন্তন, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। এভাবে ভারতবর্ষেও বহু নবী-রসুল এসেছেন। আমরা সনাতন ধর্মের সেই অবতারদের নবী-রসুল বোলে বিশ্বাস কোরি এবং তাদের আনীত শিক্ষাকে অহি এবং গ্রন্থাবলীকে আল্লাহর কেতাব বোলে বিশ্বাস কোরি। সকল নবী-রসুলের প্রতি, সকল আসমানি কেতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা একজন মোসলেমের ঈমানের অংশ। নবী-রসুল অবতারদের ধারাবাহিকতায় সবশেষে এসেছেন মোহাম্মদ (দ:)। আমরা তাঁর উপর যেমন ঈমান রাখি তেমনি এব্রাহীম (আ:), মুসা (আ:), ঈসা বা যিশু (আ:), রামচন্দ্র (আ:), শ্রীকৃষ্ণ (আ:), বুদ্ধ (আ:), কনফুসিয়াস (আ:) এঁদের সকলের প্রতিও সমভাবে ঈমান রাখি এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তাদের প্রতি সালাম পাঠাই (ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন- কোর'আন, সুরা সাফফাত ১৮১)। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য কোরি না (লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মীর রসুল- সুরা বাকারা ২৮৫)। আমরা মনে কোরি, যারা আল্লাহর প্রেরিত অবতারদের একজনকে পূজা ও শ্রদ্ধা করে আর অপর একজনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে তারা কখনোই সত্যধর্মের অনুসারী নয়। তারা কখনোই স্রষ্টার সন্তুষ্টি পাবে না, স্বর্গ বা জান্নাতলাভ তাদের সুদূর পরাহত।

প্রতিটি ধর্মের ধ্বজাধারী শ্রেণি আল্লাহর প্রেরিত ধর্মকে অতি বিশ্লেষণ কোরে সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গেছে এবং সেই বিকৃত ধর্মকে পুঁজি কোরে ব্যবসা কোরে যাচ্ছে। তারাই ভিন্নধর্মের প্রতি ঘৃণা বিস্তার কোরে মানবজাতির মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি কোরে রেখেছে, যা কখনো কখনো দাঙ্গায় রূপ নেয়। এই সাম্প্রদায়িকতাকে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার করে অসাধু রাজনৈতিক বেনিয়া। ভারতবর্ষে এই নোংরা খেলার সূচনা করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা। তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে ভাই ভাইয়ের, এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর চরম শত্রুতে পরিণত হোয়েছে। তাদের বাঁধিয়ে দেওয়া রায়টে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান জীবন হারিয়েছে, আবাসভূমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হোয়েছে। সেই রক্তক্ষরণ আজও বন্ধ হয় নি। একইভাবে ক্রুসেড-জিহাদের নামে প্রায় দু'শ বছর খ্রিস্টান ও মুসলমান যুদ্ধ চালিয়ে কত লক্ষ লোক নিহত হোয়েছে তার কোন হিসাব নেই। আমরা হেযবুত তওহীদ, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারীরা এই রক্তক্ষরণ বন্ধ কোরে সমস্ত মানবজাতিকে একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার পথের সন্ধান পেয়েছি এবং সেই লক্ষ্যে কাজ কোরে যাচ্ছি।

আমরা মানবজাতির সামনে একটি ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধোরেছি। সেটা হোল: মানুষের হাজার হাজার (হয়তো লক্ষ লক্ষ) বছরের ইতিহাসে মানুষ শান্তি পেয়েছে কেবলমাত্র স্রষ্টার বিধানে। আমরা মহাভারতে রামরাজ্যকে এবং এসলামের স্বর্ণযুগকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি। শাস্ত্রের বিধানে কি অপরিসীম শান্তি বিরাজিত ছিল তা ইতিহাস। আর যখনই মানুষ নিজেই নিজের জীবনব্যবস্থা রচনার ভার নিয়েছে তখনই অশান্তিতে পতিত হোয়েছে। বর্তমানে আমরা মেনে চোলছি পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী গণতন্ত্র যার পরিণামে আমরা চরম অন্যায় অশান্তিতে ডুবে আছি। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে স্রষ্টার বিধানে ফিরে যেতে হবে। স্রষ্টার বিধান বোলতে আমরা আদিগ্রন্থ বেদ, বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক, জিন্দাবেস্তা, তওরাত, যবুর, কোর'আন সবগুলিকেই বোঝাচ্ছি। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা কোরে কাউকে সেই ধর্মগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কথা হোচ্ছে, যার যার ধর্মে যে সত্য বর্ণিত আছে তারা সেই কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত হোলেই শান্তি আসবে। ■

সূচিপত্র

- সকল ধর্মের মর্মকথা- সবার উর্ধ্বে মানবতা- ২
- শিয়া-সুন্নী, বৈষ্ণব-শাক্ত, ক্যাথোলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট, হীনযান-মহাযান এক হোক-১০
- যে কারণে আমরা স্বজাতি-১২
- ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসুন- ১৫
- আসুন বিচ্ছেদের রাস্তা পরিহার করে সংযোগের রাস্তা খুঁজি-১৭
- দাজ্জাল কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, একটি বর্বর 'সভ্যতা'র নাম-১৮
- ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থার ফলই হলো আজকের অনৈক্য- ২১
- ঈসা (আ:) দেখালেন- 'মানবতা আগে'-২২
- উম্মতে মোহাম্মদীর সংগ্রাম কিসের লক্ষ্যে?-২৩
- জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে আমাদের প্রচেষ্টা-২৫
- প্রকৃত ধার্মিক কারা-২৯
- মানবজাতির প্রকৃত অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ-৩১
- যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হোল-৪১
- প্রচেষ্টা ও সংগ্রামহীন প্রার্থনা স্রষ্টা কবুল করেন না-৪২
- মাননীয় এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়-৪৪

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : অ্যাডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpatro14@gmail.com

The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis. (Dante)

নরকের সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটি তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে যারা ভালো আর মন্দের সংঘাতের সময় নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। -দান্তে

সকল ধর্মের মর্মকথা- সবার উর্ধ্বে মানবতা

মসীহ উর রহমান
(আমীর, হেযবুত তওহীদ)

আজ সমগ্র মানবজাতি যে নিদারুণ সঙ্কটে পতিত, তার একমাত্র কারণ আমাদের ত্রুটিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনব্যবস্থা হতে পারে দুই প্রকার- স্রষ্টার দেওয়া অথবা মানুষের তৈরি। যুগে যুগে মানুষের জীবনযাপনকে শান্তিময় করতে স্রষ্টা তাঁর নবী-রসুল-অবতারদের মাধ্যমে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন, যেগুলিকে আমরা ধর্ম বলে থাকি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে বিরাজিত মোট ধর্মের সংখ্যা ৪,২০০টি, যার মধ্যে প্রধান পাঁচটিকে বলা হয় বিশ্বধর্ম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আছেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী- প্রায় ২২০ কোটি, এসলাম ধর্মের অনুসারী ১৬০ কোটি, সনাতন ধর্মাবলম্বী ১১০ কোটি, বৌদ্ধ আছেন প্রায় ৫০ কোটি, ইহুদি আছেন ১ কোটি ৪০ লক্ষের মত। আর প্রায় ১১০ কোটি মানুষ আছেন যারা কোনো ধর্মের উপরই আস্থাশীল নন। ধর্মের প্রতি এত বিরাট সংখ্যক মানুষের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ, ধর্ম মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না। আর যে জিনিসের যে কাজ সেটা যদি তাকে দিয়ে না হয়, তাহলে সে জিনিস অবশ্যই পরিত্যক্ত হয়। তাই সমগ্র মানবজাতি, এমন কি যারা নিজেদেরকে অতি ধার্মিক বলে দাবি করেন তারাও নিজেদের সামগ্রিক জীবন থেকে স্রষ্টার বিধান বাদ দিয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থা, তন্ত্র-মন্ত্র মেনে চলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে:

(১) এই ধর্মগুলি পৃথিবীর মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

(২) পৃথিবীতে যত রক্তপাত, যত অন্যায় অবিচার তার সিংহভাগই করা হয় ধর্মের নামে। এর জন্য কারা দায়ী?

(৩) ধর্ম-বর্ণ, আস্তিক-নাস্তিক, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি শান্তিময় বিশ্ব নির্মাণ কিভাবে সম্ভব?

যে জীবনব্যবস্থা মানবচরিত্র এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে যত বেশি সঙ্গতিশীল, সেটা মানুষকে শান্তি দিতে তত বেশি সক্ষম। তাই আল্লাহর প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার একটি নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা। এমনই একটি অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে: ঐক্যই শক্তি। যে কোন জাতির সামগ্রিক উন্নতি ও প্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে ঐক্য। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সকল অশান্তির মূলে রয়েছে মানবজাতির অনৈক্য ও বিভেদ। যেমন:

(১) ধর্মীয় বিভেদ। সকল ধর্মের মধ্যে আবার আছে হাজারো দল-উপদল, মাজহাব, ফেরকা, তরিকা।

(২) পৃথিবীর বুকে কাল্পনিক রেখা টেনে মানবজাতিকে প্রায় দুইশত ভাগে খণ্ডবিখণ্ড করা হয়েছে।

(৩) পাশ্চাত্যের তৈরি বিভিন্ন মতবাদের ব্যানারে সৃষ্টি হয়েছে হাজার হাজার রাজনৈতিক দল যারা অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

এইসব বিভক্তির প্রাচীরকে যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া যায়, তবে সমস্ত মানবজাতি হবে এক মহা পরিবার।

কিন্তু কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে সৃষ্ট এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভক্তিকে বিলীন করে সকল মানুষকে এক ছাতার নিচে আনা সম্ভব?

পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক মতবাদ এবং ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্ট রেষারেষি আমাদের ঐক্যকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। এসলাম শব্দের অর্থই যেখানে শান্তি, সেখানে মোসলেম দাবিদারদের একটি বড় অংশ ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। সকল ধর্মেরই উগ্রপন্থী দল অন্য ধর্মের অনুসারীদের গাড়ি-বাড়ি দোকানপাটে হামলা চালাচ্ছে, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারছে। ১৩০০ বছর ধরে শিয়া সুন্নী একে অপরের রক্তে হাত রঞ্জিত করছে- যারা উভয়েই কিনা মুসলিম দাবিদার! কিন্তু এমন কি হওয়ার কথা ছিল? এটা কোন্ ধর্মের শিক্ষা?

মানবজাতির ঐক্য স্রষ্টার অভিপ্রায়

মানবসৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র স্রষ্টার বিধানই মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছে। এটাই মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার সঠিক মূল্যায়নই আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। হিন্দু, মোসলেম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মাবলম্বীদের আজ হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে যে, সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি, তারা একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান।

তেমনি তাদের ধর্মগুলিও একই স্রষ্টা থেকে আগত। সেই মহান স্রষ্টার অভিপ্রায় হচ্ছে, মানবজাতি একতাবদ্ধ হয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করুক, ঠিক যেমনভাবে একজন পিতা চান তার সন্তানেরা মিলেমিশে থাকুক। আল্লাহর নাজেলকৃত সকল ধর্মগ্রন্থেই আছে ঐক্যের শিক্ষা। পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সুরা এমরান ১০৩)

বেদে বলা হয়েছে:

"হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও, পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম কর, জীবনের আনন্দে সম অংশীদার হও। একটি চাকার শিকগুলো সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে যেমন গতিসঞ্চার হয়, তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলেই অগ্রগতি অবধারিত। (অথর্ববেদ, ৩/৩০/৬-৭)।

বাইবেলে ঈসা (আ:) বলেছেন, 'যে রাজ্য নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সে রাজ্য ধ্বংস হয়, আর যে শহর বা পরিবার নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সেই শহর বা পরিবার টেকে না।' (মথি ১২:২৫)

আমরা সবাই স্রষ্টার এই শিক্ষাকে বহু আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি এবং মানুষের মনগড়া কতগুলি মিথ্যাকে ধর্ম মনে করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ লালন করে চলেছি। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা যুগে যুগে মানবসমাজে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে জীবনবিধানগুলি পাঠিয়েছেন সেগুলির মৌলিক বিষয়গুলি কোনোদিন পরিবর্তিত হয় নি। কেননা সত্যের একরূপ, মিথ্যার বহুরূপ।

সত্য এক লক্ষ বছর পুরাতন হলেও তা মিথ্যা হয়ে যায় না, আবার পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একটি মিথ্যাকে মেনে নিলেও সেটা সত্য হয়ে যায় না। এজন্য সত্যধর্ম এসলামের আরেক নাম দীনুল কাইয়্যেমাহ (সুরা ইউসুফ ৪০, সুরা বাইয়্যেনাহ ৫, সুরা রুম ৩০, ৪৩)। দীন শব্দের অর্থ জীবনব্যবস্থা আর কাইয়্যেমাহ শব্দটি এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ প্রতিষ্ঠিত, আদি, শাশ্বত, চিরন্তন। যা ছিল, আছে, থাকবে। সনাতন শব্দের অর্থও আদি, শাশ্বত, চিরন্তন। এই হিসাবে আমরা বোলতে পারি, স্রষ্টার প্রেরিত সকল ধর্মই সনাতন ধর্ম। সুতরাং সকল ধর্মের অনুসারীরাই একে অপরের ভাই।

সকলের আদিতে যিনি তিনিই স্রষ্টা, সবকিছুর শেষেও তিনি (সুরা হাদীদ ৩)। তিনিই আলফা (আদি), তিনিই ওমেগা (অন্ত্য)। (Revelation 22:13). কারও কাছে তিনি আল্লাহ, কারো কাছে ব্রহ্মা, কারো কাছে গড। যে যে নামেই ডাকুক সেই মহান স্রষ্টার প্রশ্নহীন আনুগত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। তাই সনাতন ধর্মের মহাবাক্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬:২:১) অর্থাৎ একত্ববাদ। 'একম ব্রহ্মা দ্বৈত্য নাস্তি' অর্থাৎ ব্রহ্মা এক, তাঁর মত কেউ নেই। নিউ টেস্টামেন্টে বলা হচ্ছে: There is only one Lawgiver and Judge. (New Testament: James 4:12) অর্থাৎ বিধানদাতা এবং বিচারক কেবলমাত্র একজনই। কোরানের শিক্ষাও তাই, 'আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তিনি আদেশ দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কারও আনুগত্য করো না। এটাই দীনুল কাইয়্যেমাহ অর্থাৎ শাশ্বত-সনাতন জীবনবিধান। অথচ অধিকাংশ লোক তা জানে না। (সুরা ইউসুফ ৪০) এটাই এসলামের কলেমা 'লা- এলাহা এল্লা আল্লাহ'। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম মানা যাবে না।

সমস্ত মানবজাতি এক পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। বাইবেলে তাঁদের নাম অ্যাডাম ও ইভ। সনাতন ধর্মে তাঁরা আদম ও হব্যবতী। ভবিষ্যপুরাণমতে আদমকে প্রভু বিষ্ণু কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেন। তারপর তারা কলি বা এবলিসের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ রম্যফল ভক্ষণ করে স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত হন। (Old Testament – Genesis)। তবে আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, তিনি মানবজাতির জন্য সঠিক পথনির্দেশ ও জীবনব্যবস্থা পাঠাবেন যা অনুসরণ করলে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। (কোরান, সুরা বাকারা ৩৮)।

স্রষ্টার প্রেরিত সম্ভবত প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। মহর্ষী মনু, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর জৈন, মহামতি বুদ্ধ এঁরা সবাই ছিলেন ভারতবর্ষে প্রেরিত আল্লাহর নবী। বৈবস্বতঃ মনুই হচ্ছেন বৈদিক ধর্মের মূল প্রবর্তক, যাঁকে কোরানে ও বাইবেলে বলা হয়েছে নূহ (আ:), ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে রাজা ন্যূহ। তাঁর উপরই নাযেল হয় বেদের মূল অংশ। তাঁর সময়ে এক মহাপ্লাবন হয় যাতে কেবল তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা একটি বড় নৌকায় আরোহণ করে জীবনরক্ষা করেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিটি প্রাণীর এক জোড়া করে রক্ষা পায়। এই ঘটনাগুলি কোরানে যেমন আছে (সুরা মো'মেনুন-২৭, সুরা হুদ ৪০, সুরা আরাফ ৬৪, সুরা সাফফাত ৭৭), বাইবেলেও (Genesis chapters 6–9) আছে আবার মহাভারতে (বনপর্ব, ১৮৭ অধ্যায়: প্রলয় সম্ভাবনায় মনুকর্তৃক সংসারবীজরক্ষা) মৎস্যপুরাণেও আছে। যা প্রমাণ করে যে, এই সব গ্রন্থই একই স্থান থেকে আগত।

শাস্ত্রের শাসনে রামরাজ্য ও এসলামের স্বর্ণযুগ

শাস্ত্রের শাসন যখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এখানে বিরাজ করত অকল্পনীয় শান্তি। উদাহরণ হিসাবে রামরাজত্বের কথা বলতে পারি। রামরাজত্বে বাঘ ও ছাগ একসঙ্গে জলপান করত। মানুষের মধ্যে কেউ কারও শত্রু ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান ধর্মব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত ছিল না, সাধারণ মানুষও ধর্মের বিধানগুলি জানতো। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না। রাজ্যের নামই হয়েছিল অযোদ্ধা অর্থাৎ যেখানে কোন যুদ্ধ নেই। শিক্ষকের মর্যাদা ছিলো সবার উর্ধ্বে।

শাস্ত্রে বলা ছিলো, রাজাই প্রজার দুঃখ-কষ্টের কারণ। তাই প্রতিটি মানুষ তাদের জীবনে যে কোন দুঃখ দুর্দশা আসলে তারা সরাসরি রাজার কাছে জবাব চাইতো। একজন মানুষও অপঘাতে মরত না। প্রতিটি মানবশিশু হত সুন্দর, প্রতিটি মানুষ হত দীর্ঘজীবী। মহামূল্যবান রত্ন, মণি-মাণিক্যও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার হত, নারী-পুরুষ উভয়েই প্রচুর অলঙ্কার পরিধান করত। বছরের বারো মাসেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। নির্মল বাতাস মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হত। (মার্কসবাদ ও রামরাজ্য: স্বামী করপাত্রী মহারাজ, বাল্মীকি রামায়ণ এর অযোধ্যাকাণ্ড)।

ফুলে-ফলে শোভাময় সত্যযুগের কল্পিত চিত্র

কিন্তু এই শান্তি চিরস্থায়ী হয় নি। অবতারদের বিদায় নেওয়ার পর তাদের অনুসারীদের মধ্য হতে অতি ভক্তিবাদী কিছু মানুষ ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেছে এবং ধর্মকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে নিয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি বিশেষ শ্রেণির ব্যবসায়ের পুঁজি। তারা ধর্মের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে ধর্মকে দূষিত করে ফেলেছে। ফলে ধর্ম শান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই স্রষ্টা আবার নতুন অবতার পাঠিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ (আ:) অর্জুনকে বোলছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম,
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চঃ দুষ্কৃতাম,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতীর্ণ হই এবং সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করি। শ্রীগীতা ৪:৭/৮।

সুতরাং ধর্মকে পুনস্থাপন করে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই ভারতবর্ষে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির (আ:), মধ্য এশিয়ায় এসেছেন এব্রাহীম (আ:), ইহুদিদের মধ্যে এসেছেন মুসা (আ:), দাউদ, ঈসা, ইয়াহিয়া, ইয়াকুব (আ:) এমনই আরও বহু নবী রসুল। এভাবে সকল যুগে, সকল জাতি গোষ্ঠীর কাছে তাদের মাতৃভাষায় আল্লাহ নবী-রসুল ও গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। (সুরা ইউনুস ৪৮, সুরা রাদ ৮, সুরা নাহল-৩৭, সুরা ফাতির -২৫, সুরা ইব্রাহীম-৫)। তাঁদের অনেকের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামরাজ্যের অনুরূপ শান্তিময়, প্রগতিশীল সমাজ।

এঁদেরই ধারাবাহিকতায় মক্কায় আসলেন সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ (দ:)।

তিনি যে জীবনব্যবস্থা মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন সেটা যখন অর্ধ পৃথিবীতে প্রয়োগ করা হলো, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল ন্যায়, সুবিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি। সম্পদের এমন প্রাচুর্য তৈরি হয়েছিল যে, দান গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। একজন যুবতী মেয়ে সমস্ত গায়ে অলংকার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতে পারত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হত না। আদালতে মাসের পর মাস কোন অভিযোগ আসত না। আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থার প্রভাবে সত্যবাদিতা, আমানতদারি, পরোপকার, অতিথিপরায়ণতা, উদারতা, ত্যাগ, ওয়াদারক্ষা, দানশীলতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলীতে মানুষের চরিত্র পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল সত্যদীনের সর্বশেষ সংস্করণ যা আইয়ামে জাহেলিয়াতের দারিদ্র্যপীড়িত, বর্বর, কলহবিবাদে লিপ্ত, অশ্লীল জীবনাচারে অভ্যস্ত জাতিটিকে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিল। তারা অতি অল্প সময়ে অর্থনৈতিক, সামরিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং শাস্ত্রের বিধান যে সর্বদাই সত্যযুগের সৃষ্টি করে সেটাই আবার প্রমাণিত হল।

আল্লাহর শেষ রসুলের উপর অবতীর্ণ কোরান আজও অবিকৃত আছে, কিন্তু তাঁর শিক্ষাগুলিকে পরবর্তী যুগের অতি-বিশ্লেষণকারী আলেম, ফকীহ, মোফাসসেররা যথারীতি বিকৃত করে ফেলেছেন। তাদের সৃষ্ট মতবাদ ও

এসলামের শেষ সংস্করণের প্রভাবে অর্ধ-পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন্যায়, সুবিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি। যে শান্তি আজ মোসলেম নামক পথভ্রষ্ট এই জাতির জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েলের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে অগণিত ফেরকা, মাজহাব, তরিকা। তারা একদা ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন। ফলে যে মোসলেমরা ছিল অর্ধ পৃথিবীর শাসক, যারা সকল ধর্মের মানুষকে সাম্য, মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, তারাই আজ পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতা দাজ্জালের গোলাম হয়ে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার তৈরি অকার্যকর তন্ত্র ও মতবাদগুলিই যেন তাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা নিজেরাই আছে চরম অশান্তির মধ্যে তারা কী করে অন্য জাতিকে শান্তি দেবে?

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের বিষফল

ইংরেজরা আসার আগে সাতশত বছর মোসলেমরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ অনেক হয়েছে কিন্তু হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গার একটিও উদাহরণ নেই। এই সময়কালে যারা মুসলিম শাসক ছিলেন অর্থাৎ মোঘল-পাঠান-তুর্কি সুলতানরা তারা কেউই মহানবীর অনুসারীদের মত মোসলেম ছিলেন না। প্রকৃত এসলাম হারিয়ে গেছে রসুলাল্লাহর বিদায় নেওয়ার ৬০/৭০ বছর পরেই। এরপর এসলামের বিধান মোটামুটি চালু থাকলেও তার আত্মা হারিয়ে যেতে আরম্ভ করে। তবু প্রকৃত এসলামের শিক্ষার যেটুকুই অবশিষ্ট ছিল তার প্রভাবে মোসলেম শাসনামলে ভারতবর্ষ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, যার অতুল সম্পদরাশি লুট করার জন্যই বণিকের বেশে আগমন করেছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। ইংরেজরা কীভাবে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করেছিল, কিভাবে তারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষকে ভাতের অভাবে মরতে বাধ্য করেছিল, কিভাবে তাদেরকে শিয়াল শকুনের খাদ্যে পরিণত করেছিল- সে এক হৃদয়বিদারক ইতিহাস।

তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম আমাদের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে। ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতির চারিত্রিক মেরুদণ্ড তারা ভেঙ্গে দিয়েছে। জাতিকে হীনমন্যতায় আপ্লুত গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে পশ্চিমাদের থেকে নিকৃষ্ট ভাবতে শিখেছে, ছাত্রসমাজ পরিণত হয়েছে সন্ত্রাস-বাহিনীতে।

তাদের চাপিয়ে দেয়া অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, রাষ্ট্রনীতি তথা সিস্টেম মানুষকে সুদ, ঘুষ, খাদ্যে ভেজাল, রাজনৈতিক রক্তারক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। সৎ মানুষকে অসৎ হতে বাধ্য করছে। নারীকে করা হয়েছে ভোগ্যপণ্য, দিকে দিকে কেবল নির্যাতিতা, ধর্ষিতার হাহাকার। আর এই

কর্নেল হুপারের ক্যামেরায় মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষপীড়িত একটি পরিবারের ছবি। বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের সর্বত্রই তখন একই চিত্র। ব্রিটিশ সরকার খাদ্যশস্য গুদামজাত করে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানি করে তাদের ২০০ বছরের শাসনামলে ৩ কোটি ভারতবাসীকে না খেয়ে মরতে বাধ্য করেছিল।

নিজেদের তৈরি করা নরকে বসে এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষ সকল শান্তির উৎস ধর্মকেই গালাগালি করে চলেছে। মানসিক জড়তার কী ন্যাক্কারজনক রূপ!

বিকৃত এসলামের ধর্মব্যবসায়ীরা কথায় কথায় অন্য ধর্মের উপাস্য ও মহামানবদের অমর্যাদা করে কথা বলেন, তাঁদের চরিত্রহানী করেন। অথচ এঁরা যে আল্লাহর নবীও হতে পারেন এটা তাদের ধারণারও বাইরে। একইভাবে মুসলিম ছাড়া অনেকেই এটা স্বীকার করেন না যে, মোহাম্মদ (দঃ) নবী ছিলেন। তাই তাঁর ব্যাপারে ঘৃণাবিদ্বেষ ছড়াতে, কার্টুন আঁকতে বা চলচ্চিত্র বানাতে তাদের হৃদয়ে কোনো গ্লানি অনুভব করে না।

তাদের এসব কাজের ফলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। এক ভাইয়ের নির্যাতনের শিকার হয়ে আরেক ভাই পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমান। এভাবে ভারতবর্ষের কত কোটি হিন্দু-মোসলেম বাস্তুহারা হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। একইভাবে খ্রিস্টানরা ইউরোপ থেকে ইহুদি ও মোসলেমদেরকে উচ্ছেদ এবং প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিল।

"ডিভাইড এন্ড রুল অর্থাৎ ঐক্যহীন করে শাসন করো" এই ছিল ব্রিটিশদের নীতি। তারা নিজেদের শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতবর্ষে হিন্দু-মোসলেম শত্রুতার সৃষ্টি করেছিল। যখন শোষণ করার মত আর সম্পদ অবশিষ্ট ছিল না, তখন তারা স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু সেই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তারা তৈরি করে রেখে গেছে সে বিদ্বেষ আজও আমরা রক্তকণিকায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আর আমাদের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রিটিশদের প্রেতাত্মা তাঁরা এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ব্যবহার করে ভোটের যুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করে যাচ্ছেন। তাই অধিকাংশ ধর্মীয় দাঙ্গার পেছনে মূল কারণ থাকে রাজনৈতিক। মায়ানমারে বৌদ্ধরা হাজারে হাজারে জীবিত মানুষ পুড়িয়ে মারছে, আর এদেশে মোসলেমরা ভাঙছে বৌদ্ধ মন্দির, তালেবানরা আফগানে ভাঙছেন বৌদ্ধমূর্তি, চীনে মোসলেমদের দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। খ্রিস্টানরা পোড়াচ্ছে কোরান, প্রতিবাদে মোসলেমরা চালাচ্ছে আত্মঘাতি হামলা। ভারতে মসজিদ ভাঙা হচ্ছে, প্রতিবাদে এদেশে ভাঙা হচ্ছে মন্দির। আমরা যাদের অনুসারী- সেই বুদ্ধ (আঃ), যীশু (আঃ), শ্রীকৃষ্ণ (আঃ), মোহাম্মদ (দঃ)- তাঁরা কি চান আমরা এভাবে একে অপরের রক্তে স্নান করি? না, তাঁরা চান না। তবু তাঁদের নামেই চলছে এই রক্তের হোলি খেলা, পৈশাচিক নারকীয়তা। একবার ভেবে দেখুন আমাদের সবার বাবা-মা আদম-হাওয়ার কথা। আমরা- তাঁদের সন্তানেরা এই যে ধর্মের নামে শত সহস্র বছর ধরে একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছি, এই দৃশ্য দেখে তাঁদের হৃদয় কী অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হচ্ছে!

এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে যে, আমরা একই বাবা-মায়ের সন্তান হয়েও একে অপরকে অপবিত্র মনে করি? আচারের নামে এইসব অনাচার ধর্মের সৃষ্টি নয়, ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি।

হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!

ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্রিটিশদের বাঁধিয়ে দেওয়া হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গায় নিহতদের লাশ যাদের গোরস্তান বা শ্মশান কোনোটাই জোটেনি। ১৯৪৬ সনে কলকাতা শহরের একটি গলি।

ধর্ম যেন বিকৃত না হতে পারে সেজন্য, আল্লাহ সর্বকালেই ধর্মের বিনিময় গ্রহণকে হারাম করেছেন। প্রায় সকল নবীই জাতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ কথা বলেছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। পবিত্র কোরানে আল্লাহ নুহ অর্থাৎ মনু (আঃ), লুত (আঃ), শোয়াইব (আঃ), সালেহ (আঃ), হুদ (আঃ), সর্বোপরি মোহাম্মদ (দঃ) এর এই ঘোষণাগুলি উল্লেখ করেছেন।

(সুরা হুদ-২৯, ৫১, সুরা শু'আরা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, সুরা ইউনুস - ৭২, সুরা ইউসুফ-১০৪, সুরা সা'দ-৮৬, সুরা আনআম- ৯০, সুরা শুরা- ২৩, সুরা মো'মেনুনঃ ৭১-৭২, সুরা তুরঃ ৪০)

আল্লাহ আরো বলেছেন, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে এবং

বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে-

(১) তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না।

(২) আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না,

(৩) তাদেরকে পবিত্রও করবেন না

(৪) বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

(৫) এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা সঠিক পথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে

(৬) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতএব, আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল।

(৭) তাদের এই পরিণাম এজন্য যে, আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কেতাব। কিন্তু তারা সেই কেতাবের বিষয়গুলি নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। (সুরা বাকারা ১৭৫-১৭৬)।

সকল ধর্মের মত সনাতন ধর্মেও ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ।

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্ বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালং প্রেত্য জায়তে।।
(মনুসংহিতা ১১:২৪)

অনুবাদ: যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কখনও কর্তব্য নয়। কারণ যজ্ঞ করতে মৃত্যুর পর প্রবৃত্ত হ'য়ে ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করলে চণ্ডাল হ'য়ে জন্মাতে হয়।

যজ্ঞার্থমথং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।।
(মনুসংহিতা ১১:২৫)

অনুবাদ: যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হ'য়ে থাকে। (মনুসংহিতা ১১:২৪-২৫)

ঈসা (আ:) পূর্ববর্তী ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি একদিন বায়তুল মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকজন এবং ধর্মগুরুদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"আলেমেরা ও ফরীশীরা শরীয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে মুসা (আ:) এর জায়াগায় আছেন। সুতরাং এরা যা কিছু করতে আদেশ করেন তোমরা তা পালন করো। কিন্তু তারা যা করেন সেটা তোমরা অনুসরণ করো না, কারণ তারা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। তারা ভারী ভারী বোঝা মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আংগুলও নাড়াতে চান না। তাদের সব কাজই লোক দেখানোর জন্য। দাওয়াতের সময় এবং উপাসনালয়ে তারা সম্মানজনক আসনে বসতে ভালোবাসেন। হাটে-বাজারে তারা সম্মান খুঁজে বেড়ান আর চান যেন লোকেরা তাদের প্রভু বা রাব্বাই বলে ডাকে। কিন্তু কেউ তোমাদেরকে প্রভু বলে ডাকুক তা তোমরা চেয়ো না, কারণ তোমাদের প্রভু বোলতে কেবল একজনই আছেন। আর তোমরা সবাই ভাই ভাই।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, কী নিকৃষ্ট আপনারা! আপনারা মানুষের সামনে জান্নাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না। একদিকে আপনারা লোকদের দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, কী ঘৃণ্য আপনারা! আপনারা পুদিনা, মৌরি আর জিরার অংশ আল্লাহকে ঠিকঠাক দিয়ে থাকেন; কিন্তু আপনারা মুসা (আ:) এর শরীয়তের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়েছেন। যেমন সুবিচার, দয়া এবং সততা। আপনাদের উচিৎ আগে এইগুলি পালন করা এবং অন্য বিধানগুলিকেও বাদ না দেওয়া। আপনারা নিজেরাই অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনারা ছাঁকেন অথচ উট গিলে ফেলেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ঘৃণ্য আপনারা। আপনারা বাসনের বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু পাত্রের ভিতরে আছে কেবল সেই নোংরা জিনিস যা মানুষের উপর জুলুম আর স্বার্থপরতা দ্বারা আপনারা লাভ করেছেন। অন্ধ ফরীশীরা, আগে পাত্রের ভিতরের ময়লাগুলি পরিষ্কার করুন, তার বাইরের দিকটা আপনিই পরিষ্কার হবে।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, কী জঘন্য আপনারা! আপনারা সাদা ঝকঝকে রং করা কবরের মত, যার বাইরে থেকে দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার ভেতরে আছে মরা মানুষের হাড়-গোড় ও পঁচা গলা লাশ। ঠিক সেইভাবে, বাইরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক কিন্তু ভিতরে মোনফেকী আর পাপে পরিপূর্ণ।

হে সাপের দল আর সাপের বংশধরেরা! কিভাবে আপনারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন?" (নিউ টেস্টামেন্ট: ম্যাথু ২৩ : ১-৩৪)

ধর্মব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ এত কঠোর অবস্থানে থাকলেও প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই শ্রেণিটির জন্ম হয়েছে এবং তারা সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে ধর্মকে দূষিত করে ফেলেছে এবং ধর্মকে মসজিদ-মন্দিরকেন্দ্রিক করে ফেলেছে। স্রষ্টা কি শুধু মসজিদ-মন্দিরে-চার্চে-প্যাগোডায় থাকেন? না। তিনি বলেছেন, 'আমি ভগ্ন-প্রাণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে অবস্থান করি।' 'বিপদগ্রস্তদেরকে আমার আরশের নিকটবর্তী করে দাও। কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি।' (হাদিসে কুদসী, দায়লামী ও গাজ্জালী)।

অথচ ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের ভালোমন্দের দায়িত্ব অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য উপাসনালয়ে ঢুকেছেন।

জান্নাতে, স্বর্গে কারা যাবেন?

একটি বিরাট প্রশ্ন, জান্নাতে বা স্বর্গে কারা যাবেন? সকল ধর্মের, সকল মাজহাবের উপাসকেরা বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র তারাই সঠিক, আর সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং জান্নাতে, স্বর্গে বা হ্যাভেনে কেবল তারাই যাবেন। কেবলমাত্র আসলে কি তাই? না। বরং সকল ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে বস্তুত জান্নাতে বা স্বর্গে ঠাঁই পাবেন যারা একমাত্র স্রষ্টার বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যায়।

নামাজ, রোজা, উপবাস, উপাসনা ধর্মের মূল বিষয় নয়। স্রষ্টা মানুষের কাছে খানা-খাদ্য চান না, তাঁকে ভোগ দিয়ে লাভ নেই। বরং এই দুধ কলা যদি ক্ষুধার্তকে দেওয়া হয় তাতেই তিনি খুশি হন। মানুষের পেটে যখন ভাত নেই, উপাসনালয় থেকে যখন জুতা চুরি হয়, যেখানে দুই বছরের শিশুও ধর্ষিত হয় সেখানে যারা মসজিদে-মক্কায়-বেথেলহেমে গিয়ে মনে করছেন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, গয়া-কাশিতে গিয়ে মনে করছেন দেবতা বুঝি স্বর্গ থেকে তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছেন, তারা ঘোর ভ্রান্তির মধ্যে আছেন। কারণ এসবে আল্লাহর দরকার নেই। তিনি বলেছেন,

'পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। বরং পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহকে ভালোবেসে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে।' (সুরা বাকারা ১৭৭)।

কেবল তাদের উপসনাই আল্লাহ কবুল করেন যারা নিরন্তর মানুষের কল্যাণে কাজ করে যায়। রসুলাল্লাহ বলেন, "যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত থাকে আল্লাহ তাদের দোয়া এমনভাবে কবুল করেন যেরূপভাবে তিনি রসুলদের দোয়া কবুল করেন।" (হাদীসে কুদসী, জুমানাহ বাহেলী থেকে আবুল ফাতাহ আযাদী)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সে অধিক ধার্মিক।" (রামেশ্বর-মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

বুদ্ধ (আঃ) বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদি, মধ্য এবং অন্ত্যে কল্যাণ।'

সুতরাং কেবল ধ্যান করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ নয়, মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণই ছিল বুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য।

একইভাবে যীশু (আঃ) ইহুদিদের প্রার্থনার দিন তওরাতের বিধান লঙ্ঘন করে অন্ধ, রুগ্ন, খঞ্জকে সুস্থ করে তুলেছেন।' (নিউ টেস্টামেন্ট: মার্ক ৩, লুক ১৪)।

সাবাথের দিনে মানুষকে সুস্থ করা ছিল ধর্মজীবীদের দৃষ্টিতে অপরাধ। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রশক্তিকে উস্কিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে।

এভাবেই সকল নবী ও রসুল শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই ধর্ম বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তাই ওঙ্কার ধ্বনীর অর্থ শান্তি, এসলাম শব্দের অর্থও শান্তি, আবার বৌদ্ধ ধর্মেরও মূল লক্ষ্য 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত- জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।' যে ধর্ম মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সেটা আত্মাহীন ধর্মের লাশ। প্রদীপের শিখা নিভে গেলে সেটা আর আলো দিতে পারে না, দিতে পারে শুধু কালি। তাই আজ সারা বিশ্বে যে ধর্মগুলি চালু আছে সেগুলোর বিকৃত অনুসারীরা মানুষকে আলোকিত করার বদলে কালিমালিপ্ত করছে, শান্তির বদলে বিস্তার করছে সন্ত্রাস।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে হয়। রসুল বা অবতারগণের পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর তাঁদের অনুসারীরা অনেক ক্ষেত্রেই অতি ভক্তির প্রাবল্যে তাকে ক্রমশঃ উর্ধ্ব উঠাতে উঠাতে স্বয়ং স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিয়েছেন অথবা স্রষ্টাই নবীর মূর্তিতে স্বশরীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস ও প্রচার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সনাতন ধর্মের অবতারবাদ, খ্রিস্টধর্মের ত্রি-তত্ত্ববাদের কথা বলা যেতে পারে।

আমাদের কথা হচ্ছে তাঁরা স্বয়ং স্রষ্টা হোন, অবতারই হোন অর ঈশ্বরের পুত্রই হোন তাদের সকলের জীবনের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা সেই উদ্দেশ্য আমরা কতটুকু পূরণ করতে পারলাম সেটা বিবেচনা করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তা না করে, মানবজাতিকে ঘোর অশান্তির মধ্যে ফেলে রেখে কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা ক্রাইস্টকে যতই সম্মানের উচ্চ শিখরে বসানো হোক না কেন, তাতে তাদের সম্মান মোটেই বৃদ্ধি পাবে না, তাঁরাও এতে খুশি থাকবেন না।

বুদ্ধ (আঃ) এর সময় বক্কলি নামে একজন ভক্ত মুনি ছিলেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধ (আঃ) এর জ্যোতির্ময় দেহের দিকে ভক্তিচিত্তে চেয়ে থাকতেন। বুদ্ধ (আঃ) দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে এক সময় তাঁকে ডেকে বললেন, এই ধ্বংসশীল দেহের দিকে চেয়ে থেকে ফল কি? আমার নীতি-আদর্শ অনুসরণ করো। আবেগ ত্যাগ করো। নিজের মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোক উৎপাদনের বীজ বপন করো। নিজেকে আলোকময় করে গড়ে তোলো।'

লোক্‌নাথ ব্রহ্মচারীও ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোরা আমার চরণ ধরিস না, আচরণ ধর।' সুতরাং ভক্তি বন্দনার চেয়ে মহামানবদের শিক্ষাকে ধারণ করে মানবতার কল্যাণে কাজ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা হেযবুত তওহীদ কাউকে কোন বিশেষ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করছি না। আমাদের কথা হচ্ছে, আমরা সকলেই যদি শান্তি চাই, সকলেই যদি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিময় পৃথিবী উপহার দিতে চাই, তবে এজন্য আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ্বেষ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এ কথাতে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই একমত হবেন? কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবো কিসের ভিত্তিতে?

মানবজাতির ঐক্যসূত্র প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাবনা

আমাদের সকলের স্রষ্টা এক, একই পিতা-মাতার রক্ত আমাদের সবার দেহে। সকল নবী-রসুল-অবতারগণও এসেছেন সেই এক স্রষ্টার পক্ষ থেকে। তাই শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে স্রষ্টার হুকুমের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদেরকে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'র চাপিয়ে দেওয়া তন্ত্রমন্ত্র, সর্বপ্রকার ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সকল প্রকার সন্ত্রাস, হানাহানির বিরুদ্ধে এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে।

অতএব, আসুন, আমরা কোন কোন বিষয়ে আমাদের মিল আছে সেগুলি খুঁজে বের করি, অমিলগুলো দূরে সরিয়ে রাখি, বিচ্ছেদের রাস্তা না খুঁজে সংযোগের রাস্তা খুঁজি। আজকে যারা ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে বিভেদের মন্ত্র

শেখায়, দাঙ্গা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিস্তার করে তারা আল্লাহর উপাসক নয়, তারা শয়তান বা আসুরিক শক্তির উপাসক। তাদের গন্তব্য নিশ্চিত জাহান্নাম।

"এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনগড়া কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন দাঙ্গাপ্রিয় লোক। যখন তারা ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। অথচ আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তাদের পাপ তাদেরকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তাদের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। (সুরা বাকারা ২০৪-৬)।

রাজনীতিক ভাই ও বোনেরা, আসুন ঐক্যবদ্ধ হই

আমাদের মধ্যে যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের কথা হচ্ছে, 'নিঃসন্দেহে মানুষের কল্যাণই আপনাদের জীবনের ব্রত। সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই তাই। সুতরাং, আমরা যে যেই দলই কোরি না কেন, আজ মানবতা যখন বিপন্ন, আমাদের সকলের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, তখন নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে, নিজেদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আপাততঃ স্থগিত রেখে ঐক্যবদ্ধ হই। মানুষের জন্যই রাজনীতি, আগে মানুষকে বাঁচাই। যারা এসলামকে ভালোবাসেন তারাও আসুন, একে অপরের ত্রুটি সন্ধান না করে, ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি না করে এক স্রষ্টার বিধানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যবদ্ধ হই।'

যুগনেতার আবির্ভাব ও কিংডম অব হ্যাভেনের পথরচনা

কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে আবার মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ভারতবর্ষে আগত কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, বুদ্ধ প্রমুখ নবীদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'আলাইহে আস সালাতু আস সালাম' ব্যবহার করেছেন; এর দ্বারা তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ ও মোসলেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক প্রাচীরের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন। এজন্য তাঁকে ধর্মব্যবসায়ী আলেম-মোল্লাদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাঁর লেখা বই পোড়ানো হয়েছে, তাকে কাফের, খ্রিস্টান অর্থাৎ ধর্মত্যাগী ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, এমন কি এজন্য তাঁকে মিথ্যা মামলারও শিকার হতে হয়েছে; তবু তিনি সত্যের উপর ছিলেন অবিচল। এ উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁর পূর্বপুরুষদেরও রয়েছে বিরাট ভূমিকা। ১৫৭৬ পর্যন্ত পন্নী পরিবার ছিলো বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সহ বৃহত্তর গৌড়ের শাসক। এদেশের শাসনে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের বিরাট অবদান রয়েছে। মাননীয় এমামুয্‌যামান সর্বপ্রকার অনৈক্যের দেয়াল ভেঙ্গে সমগ্র মানবজাতিকে এক পরিবারে পরিণত করার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি কোরান, বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক, তওরাত, গীতা সকল ঐশী গ্রন্থগুলিকে বইয়ের শেলফে একই সঙ্গে রাখতেন। বোলতেন, 'এগুলি সবই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু আজকে হিন্দু-বৌদ্ধ-মোসলেম-ইহুদি-খ্রিস্টান কেউই তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ করছে না।'

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, সত্যযুগ আবার আসবে (বিষ্ণুপুরাণ), মোসলেমরাও বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ পৃথিবীকে এমন ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করে দিবেন ঠিক ইতোপূর্বে পৃথিবী যেমন অন্যায় ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল (আবু দাউদ)। আর বাইবেলে পাই কিংডম অব হ্যাভেনের আগমনী বার্তা যখন কিনা নেকড়ে ও ভেড়া একত্রে বিচরণ করবে (নিউ টেস্টামেন্ট: ঈসাইয়াহ ১১:৬)।

এখন প্রশ্ন হল সেই সত্যযুগ বা কিংডম অব হ্যাভেন আসবে কী ভাবে? এটা কি এমনি এমনিই আসবে? না। শান্তি বা অশান্তি মানুষের কর্মফলমাত্র। পবিত্র আত্মা ঈসা (আ:) এ কথাই বলেছিলেন, The kingdom of heaven is at hand. (Matthew 10:7)- স্বর্গরাজ্য হাতের মুঠোয়। মহাভারতে বলা হয়েছে, "রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্যপালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্মসঞ্চার হয় না।" (কালী প্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০৭)।

সুতরাং সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার এটাই মূল মন্ত্র, স্রষ্টা প্রদত্ত বিধান অনুসারে রাজ্যপালন করতে হবে। মানুষের তৈরি বিধান দিয়ে কস্মিনকালেও শান্তি আসবে না। আর আজকের দুনিয়ায় বিরাজিত ধর্মগুলি যেন একেকটি মরা লাশ, সুতরাং সেগুলি দিয়েও শান্তি আসবে না। আগে সেই লাশগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই প্রাণ হল স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব, এক স্রষ্টা ছাড়া আর কারও হুকুম না মানা। এটুকু মেনে নিলেই ধর্মগুলি আবারও মানুষকে শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে সক্ষম হবে। সুতরাং সত্যযুগের শান্তি ফিরিয়ে আনা- এখন আপনার একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

নবী-রসুল-অবতারদের চরণে আমাদের আবেদন

হে মনু-কৃষ্ণ-রামচন্দ্র-বুদ্ধ-মুসা-ঈসা (আ:), হে আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:)। আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা আপনাদের সম্প্রদায়ের কাছে আপনাদের প্রকৃত শিক্ষাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনারা যে লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, আমরাও আপনাদের সন্তান হিসাবে সেই পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করেছি, আমাদের জীবন ও পার্থিব সম্পদ যা আছে তা এই সংগ্রামের জন্য উৎসর্গ করেছি। এই কঠিন পথে চলার জন্য আপনাদের দোয়া, আশীর্বাদ আমাদের বড় প্রয়োজন। আপনারা দোয়া করুন যেন আমরা সত্যধর্মের ভিত্তিতে মানবজাতিকে স্রষ্টার হুকুমের উপর একতাবদ্ধ করতে পারি। আমরা সমগ্র মানবজাতি যেন সকল ভেদাভেদ ভুলে এক পরিবারের ন্যায় এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারি। আমীন। ■

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩,
০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

এক স্রষ্টার শিক্ষাই পারে ফেরকা, মাজহাব, তরিকা, জাত-পাত, আচার-বিচার ভুলে সমগ্র মানবজাতিকে এক কোরতে।

শিয়া-সুন্নী, বৈষ্ণব-শাক্ত, ক্যাথোলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট হীনযান-মহাযান এক হোক

মনিরুয্যামান মনির

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এ[illegible] নবী-রসুল ও অবতারগণ। তাঁদের এবং তাঁদের [illegible]ত অসংখ্য মুনি-ঋষি-তাপসের পদধূলিতে গোটা ভারতভূমিই যেন এক বিরাট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হোয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ, জাগোরে ধীরে,
> এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

যুগে যুগে আগত সনাতন ধর্মের নানা সংস্কারকদের শিক্ষাকে কেন্দ্র কোরে এক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বহু দল-উপদল ও সম্প্রদায়। প্রতিটি দল নিজেদেরকে অন্য দলের তুলনায় সঠিক বোলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা এক ধর্মের অনুসারী হোয়েও ধর্মীয়ভাবে ও আত্মিকভাবে বিভক্ত। আমাদের দেশে শারদীয় দুর্গা পূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব, অথচ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ত্রিপুরা ইত্যাদি এলাকার বাইরে ভারতের বেশির ভাগ হিন্দুই দুর্গা পূজা করেন না। আবার উত্তর ভারতে যে রামকে (আ:) ঘটা করে পূজা করা হয় সেই রামকে কেন্দ্র কোরে এখানে কোন পূজা হয় না। মহারাষ্ট্রের লোকেরা পূজা করে গণপতি গণেশকে। এমনকি দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার হিন্দুদের বিরাট অংশ রাবণকেও পূজা করে। তাদের নিজ নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ কোরতে গিয়ে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় তারা বহু রক্ত ঝরিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে তারা কখনও এক হোতে পারেনি, এখনো পারছে না। কিন্তু সকল সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ের মানুষের একটিই কামনা, স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি। সেই স্রষ্টা কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, স্রষ্টা সমগ্র মানবজাতির। যেই তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে, তাঁর কাছে পথের সন্ধান করে স্রষ্টা তাকেই পথ দেখান। তিনি পবিত্র কোর'আনে বোলেছেন যে,

'আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা ১৮৬)।

সুতরাং কে কোন ধর্মের অনুসারী, কে কোন মাযহাব-ফেরকার অনুসারী সেটা আল্লাহ দেখেন না। সুতরাং যে

যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহর হুকুম মান্য করা। এ কথাটিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বোলেছিলেন যে,

'যত মত, তত পথ। সব মতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাঁর কাছে ভক্তের কোন জাত-পাতের বিচার নেই। হিন্দু-মোসলেম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সবাই যে নামেই তাঁকে ডাকুক, সবই তাঁর কাছে পৌঁছায়।'

সকল মহাপুরুষই চান মানবজাতির ঐক্য, কারণ তারা জানেন যে ঐক্যের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। তা সত্ত্বেও ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি ধর্মকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে রাখার জন্য বিভিন্ন মনগড়া প্রথাকে ধর্মের মধ্যে প্রবেশ কোরিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রচারের গুণে হিন্দুধর্মের মধ্যে আচার-বিচার, জাত-পাত এবং ছোঁয়াছুঁয়িটাই প্রধান হোয়ে উঠেছে। মহামানবদের শিক্ষা বইয়ের পাতায় মুদ্রিত থাকলেও বাস্তবে হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত যেমন: বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও আছে নানা উপদল। এছাড়া আছে প্রাচীনকাল থেকে চলমান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, শুদ্র ইত্যাদি বর্ণভেদ। একত্ববাদী ব্রাহ্মরাও কম নয়। এতসব বিভক্তি বজায় রেখে একটি জাতি খুব বড় কিছু কোরতে পারে না।

এক গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরাও হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান ইত্যাদি উপদলে বিভক্ত। দেশ ও অঞ্চলভেদে ছোটবড় বিভক্তিও আছে অসংখ্য। খ্রিস্টানদের মধ্যেও আছে প্রধান দুই ভাগ- প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথোলিক; উইকিপিডিয়ার 'অসম্পূর্ণ' তালিকা অনুযায়ী খ্রিস্টধর্মের মোট উপদলের সংখ্যা ৪১,০০০। তথ্যটি অবিশ্বাস্য হলেও অসত্য নয়। ইউরোপের মধ্যযুগে এই ক্যাথোলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিবাদ চরম আকার ধারণ করেছিল। ত্রিশ বর্ষব্যাপী (১৬১৮-১৬৪৮) এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হোয়েছিল সমগ্র ইউরোপজুড়ে, যার মূল যুদ্ধক্ষেত্র ছিল মধ্য ইউরোপ যেখানে আজকের জার্মান রাষ্ট্রটি অবস্থিত। ইউরোপের প্রায় সকল দেশই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এটি ছিল ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ এবং আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কেবল সুইডিশ সেনাবাহিনীর হাতে জার্মানের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ নিহত হোয়েছিল, দুর্গ ধ্বংস হোয়েছিল ২,০০০টি, ১৮,০০০ গ্রাম ১,৫০০ শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হোয়েছিল।

আজ আমরা হিন্দু-মোসলেম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলির চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেমের ফাঁদে পড়ে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি, অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার ইত্যাদির মধ্যে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশদের হাত থেকে আমরা এই উপমহাদেশের বাসিন্দারা স্বাধীন হোয়েছি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমরা স্বাধীন হই নি। ১৯৭১ সনে আবারও আমরা সবাই মিলে যুদ্ধ কোরে বাংলাদেশ নামক আরেকটি ভূখণ্ড লাভ কোরেছি কিন্তু যে জন্য এত সংগ্রাম অর্থাৎ অন্যায় অবিচারহীন একটি সমাজগঠন, সেটা কি আমরা কোরতে সক্ষম হোয়েছি? না। আমরা দিন দিন আরও বেশি কোরে পাশ্চাত্যের পদানত গোলামে পরিণত হোচ্ছি।

আল্লাহর শেষ নবী ও রসুল মোহাম্মদ (দ:) আরবের গোত্রের সঙ্গে গোত্রের সংঘাত নিরসন কোরে, গোত্র, বর্ণ, বংশ, আভিজাত্য প্রথা নির্মূল করে বৃহত্তর জাতি গঠন করেছিলেন, সেই মোসলেমরাও মানব সৃষ্ট মতবাদের অনুসরণ আর ফেরকাবাজির কারণে শত শত মাজহাবে, তরিকায় বিভক্ত। এই শিয়া-সুন্নী যুদ্ধে গত কয়েক শতাব্দী ধরে কত লক্ষ মোসলেম নিহত হয়েছে এবং আজও এই দ্বন্দ্বে শহর-বন্দর ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে তার হিসাব মেলানোই কঠিন। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য আজ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে এই ফেরকাবাজির ফলে। কথায় কথায় মোসলেমরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গালি দিয়ে থাকেন মোসলেমদের উপর নানামুখি নির্যাতন, অত্যাচারের কারণে, শোষণ-বঞ্চনার কারণে। কিন্তু একবারের জন্যও মোসলেম নামক এই জাতিটি ভেবে দেখে না যে, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে নানা তর্ক, বাহাস কোরে শত শত মজহাব, তরিকায় বিভক্ত হয়ে জাতি হিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে তারা। আর তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। শত্রুরা দুর্বলতার সুযোগ নেবে এটাই স্বাভাবিক। এটা তো শত্রুর দোষ নয়, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা। কাজেই মোসলেমদের অধঃপতনের পেছনে পাশ্চাত্যরা যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী তারা নিজেরাই। আমরা হেযবুত তওহীদ, যামানার এমামের অনুসারীরা চেষ্টা কোরে যাচ্ছি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষকে একটি মহাসত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ কোরতে যে, আপনারা সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই বাবা-মায়ের সন্তান। আপনারা যে যে ধর্মের অনুসারীই হোন না কেন, সব ধর্মই চায় মানুষ তার নিজের কল্যাণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হোক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলেছিলেন-

হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথে মুসলিমদের আচার-প্রথা বাধা নয়- বাধা তাদের ধর্ম, আর হিন্দুদের ধর্ম বাধা নয় বাধা হোচ্ছে আচার-প্রথা।

এর থেকে বুঝা যায় যে হিন্দু ধর্ম আচার সর্বস্ব ধর্ম। সে সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হোয়েছিল- তাহলে কিভাবে ভারতে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য হবে? তিনি বোলেছিলেন- 'শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যমেই ভিতরের বাধা দূর কোরতে হবে।' একই কথা সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্য। একমাত্র সত্যের শিক্ষাই পারে জাত-পাত, আচার-বিচার, ধর্মাধর্ম ভুলে মানবজাতিকে এক কোরতে। সেই শিক্ষা কি ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষা? না। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিই হোল- ভাগ কর শাসন করা, ডিভাইড অ্যান্ড রুল আর উদ্দেশ্য হোল- শোষণ করা। এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যই আমাদেরকে টুকরো টুকরো কোরে ভাগ কোরে ফেলা। তাদের দেওয়া স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন, বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থাই আজ মানুষকে পশুর চেয়ে নীচে নামিয়ে দিয়েছে।

আমরা চাই মোসলেমরা শিয়া-সুন্নী বিভেদ ভুলে একতাবদ্ধ হোক, হিন্দু-মোসলেম একতাবদ্ধ হোক, বৈষ্ণব-শাক্ত একতাবদ্ধ হোক, হীনযান-মহাযান এক হোক, প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথোলিক এক হোক। তারা ধর্মের ছোটখাটো বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের মতভেদগুলি পাশে সোরিয়ে রেখে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলির উপর একতাবদ্ধ হোক। আসুন, আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলি ৭০০ কোটি আদমসন্তানের এক বিশাল ভ্রাতৃসমাজ।

যে কারণে আমরা স্বজাতি

আজকের পৃথিবীতে প্রধান প্রধান ধর্মীয় জাতিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে যতগুলো অমিল লক্ষ্য করা যায়, তার চেয়ে বহু বেশি মিল পরিদৃষ্ট হয়। অথচ রাজনৈতিক কারণসহ বিভিন্ন কারণে কেবলমাত্র জাতিগুলোর অমিল বা মতদ্বৈততা আছে এমন বিষয়গুলোকেই বারংবার সামনে আনা হয়, আর মিলগুলোকে সুচতুরভাবে দূরে সোরিয়ে রাখা হয়। ধর্মব্যবসায়ী ও স্বার্থবাদী রাজনীতিকদের এই কপটতার বলী হয় সকল ধর্মের সাধারণ মানুষেরা। তাই ধর্মব্যবসায়ীরা যাতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত কোরে কোনোরূপ অনর্থ ঘটাতে না পারে তার জন্য সকল ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় অতি প্রয়োজনীয়।

সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং মোসলেমরা কিভাবে স্বজাতি?

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রায় ১১০ কোটি সনাতন ধর্মের অনুসারী রোয়েছেন। ধর্মীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মগ্রন্থের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এই জাতিটি বরাবরই ধর্মানুরাগী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে এসেছে। পৃথিবীতে সম্ভবত তাদের মতো প্রাচীন গ্রন্থের অধিকারী দ্বিতীয় কোনো নৃ-গোষ্ঠী নেই। বহু নবী-রসুল অবতারের আগমন ঘটেছে এই ভারতবর্ষে যারা সকলেই ছিলেন সনাতন ধর্মের ধারক। সনাতন শব্দের অর্থ যা নিত্য, চিরসত্য, স্বতঃসিদ্ধ, শাশ্বত। আল কোর'আনে এসলামকে বলা হোয়েছে 'দীনুল কাইয়্যেমা'। এই কাইয়্যেমাহ শব্দের অর্থও ঐ একই- যা সনাতন, নিত্য, শাশ্বত। সে হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আর মোসলেমরা শুধু যে স্বজাতি তা-ই নয়, তাদের উভয়ের ধর্মের নাম পর্যন্ত অভিন্ন। কিন্তু অতি সুচতুরভাবে সনাতন ধর্ম থেকে এসলাম ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য 'হিন্দু' শব্দটিকে সনাতন ধর্মের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হোলো। এই এলাকার মানুষের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম কখনোই বলা হোত না। হিন্দু ধর্ম বা Hinduism এই শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা যা ছিল তাদের সুচতুর ষড়যন্ত্রের একটি পদক্ষেপমাত্র। আমার এ কথায় কারো সন্দেহ থাকলে দয়া কোরে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ২০ খণ্ডের ৫১৯ পৃষ্ঠায় Hinduism অধ্যায়টি দেখে নিতে পারেন। সেখানে বলা হোয়েছে, "The term Hinduism ... [was] introduced in about 1830 by British writers."

এর ফল হোলো এটাই যে, হিন্দু ও মোসলেম দুটো দুই জাতি হোয়ে গেল। একে অপরের থেকে দূরে সরে গেল। সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটানো সহজ হোয়ে গেল। হিন্দু কাকে বলে? ইতিহাস থেকে জানা যায়, সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলকে হিন্দুস্তান বোলে আখ্যায়িত কোরত পারস্যে মোসলেমরা। অর্থাৎ এটি ছিল একটি ভৌগোলিক পরিচয়ের বিষয়, ধর্মীয় পরিচয় নয়। এখন কথা হোচ্ছে, হিন্দুস্তানের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে যদি কোন জনগোষ্ঠীকে হিন্দু বোলে আখ্যা দেওয়া হয়, তাহোলে সিন্ধুর অববাহিকায় আরও যত নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে এবং কোরবে তাদেরকেও হিন্দু বলা অযৌক্তিক হবে না।

সকল মানুষ একই পিতা-মাতা আদম হাওয়ার সন্তান, সকলেই ভাই-বোন। সনাতন ধর্মের গ্রন্থে এই আদি পিতা-মাতাকে আদম ও হব্যবতী বোলে উল্লেখ করা হোয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রাথমিকভাবে মহর্ষী মনুর (আ:) অনুসারী। মহর্ষী মনুই (আ:) হোচ্ছেন কোর'আনে বর্ণিত নূহ (আ:)। সুতরাং মোসলেম ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আদিতে একই নবীর অনুসারী। নূহ (আ:) এর মাধ্যমেই মানবজাতির বংশ রক্ষিত হয়, তাই পৃথিবীতে বিরাজমান সকল মানুষের পূর্বপুরুষগণ একসময় নূহের (আ:) অনুসারী এতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে ভারতবাসীকে পথ দেখাতে এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা কোরতে আবির্ভূত হোয়েছেন আরও বহু নবী-রসুলগণ যাঁদেরকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় অবতার। শ্রীকৃষ্ণ (আ:), যুধিষ্ঠির (আ:), বুদ্ধ (আ:), মহাবীর (আ:) এরা সকলেই ছিলেন আল্লাহর সত্য নবী। সত্য কখনো পৃথক হয় না, সত্যের একরূপ। তাই সকল সত্যনবীর অনুসারীদেরও এক জাতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ্রিস্টানদের সাথে মোসলেমদের শত্রুতার পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের চক্রান্তই প্রধান হোলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের তারতম্যও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু আদতে খ্রিস্টান ও মোসলেম ভিন্ন জাতি নয়। মোসলেমরা যেমন আল্লাহ তথা ঈশ্বরের প্রেরিত নবী মোহাম্মদের (দ:) অনুসারী, তেমনি খ্রিস্টানরাও ঐ ঈশ্বরেরই প্রেরিত অপর এক নবী যিশুর (আ:) অনুসারী দাবিদার। খ্রিস্টান ও মোসলেম উভয়েই একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই মাতা-পিতার সন্তান। এসলাম ধর্মে তাদেরকে বলা হোয়েছে আদম-হাওয়া, আর বাইবেলে বলা হোয়েছে অ্যাডাম-ইভ। খ্রিস্টানরা যাকে বলেন জেসাস-ক্রাইস্ট, মোসলেমরা তাঁকেই বলেন ঈসা (আ:)। যিশু খ্রিস্টকে (আ:) সম্মান করা, তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া শুধু একজন মোসলেমের কর্তব্যই নয়, ঈমানী দায়িত্ব। কোন মোসলেম যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হবে, কারণ তাঁকে অস্বীকার কোরলে প্রকারান্তরে স্রষ্টাকেই অস্বীকার করা হয় (সুরা নেসা-১৫১)। ঈসা (আ:) আল্লাহর তওহীদ তথা একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন। বাইবেলে আমরা পাই, একদিন একজন লোক তাঁর কাছে জানতে চাইলো, সকল অনুশাসনের (commandment) মধ্যে সর্বপ্রথম অনুশাসন কি? ঈসা (আ:) উত্তরে বোললেন, "শোন হে বনী ইসরাইল। সর্বপ্রথম অনুশাসন হোচ্ছে আমাদের প্রভু আল্লাহ হোচ্ছেন একমাত্র প্রভু "The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord." (The 12th chapter of Mark) মোসলেমদের বিশ্বাসও তাই। যারা খ্রিস্টান নামধারী কিন্তু না মানে ইঞ্জিলের বিধান, না মানে ঈসা (আ:) এর উপদেশ এক কথায় যারা স্রষ্টার

বিধান মানে না তারা আসলে ঈসা (আ:) এর অনুসারী নয়, যতই তারা দাবী কোরুক। তেমনিভাবে যারা না মানে কোর'আনের বিধান, না অনুসরণ করে শেষ নবীর আদর্শ, তারা মোসলেম বংশোদ্ভূত হোলেও মোসলেম নয়, উম্মতে মোহাম্মদী নয় যতই দাবি কোরুক না কেন। বাইবেল বলছে যিশু খ্রিস্ট আবার আসবেন, হাদিসেও বলা আছে তিনি আবার আসবেন এবং এসে দাজ্জাল ধ্বংস কোরবেন। খ্রিস্টানরা অপেক্ষা কোরছেন- যিশু খ্রিস্ট এসে এন্টি ক্রাইস্ট ধ্বংস কোরবেন, 'কিংডম অব হ্যাভেন' প্রতিষ্ঠা কোরবেন; মোসলেমরাও অপেক্ষা কোরছেন- ঈসা (আ:) পৃথিবীতে এসে দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে এমন শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরবেন যে, নেকড়ে আর ভেড়া এক সাথে থাকবে। তাহলে মোসলেম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? উভয় জাতির মধ্যে শত্রুতার কোনো ভিত্তি রইল কি?

পবিত্র কোর'আনে সুরা নেসার ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "আহলে কিতাবদের প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার [ঈসা (আ:) এর] উপর ঈমান আনবেই।" আবার সুরা আল এমরানের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, " তোমার [ঈসা (আ:) এর] অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি।" ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলায় অনুদিত কোর'আনের ফুটনোটে ঈসার (আ:) অনুসারী বলতে মোসলেমদেরকেই বোঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে মোহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাবের পর থেকে ঈসা (আ:) এর প্রকৃত অনুসারী তো তারা যারা মোসলেম অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর সকল রসুলগণের উপরই বিশ্বাস রাখে। মোসলেম শব্দের অর্থ বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণকারী। সুতরাং যারাই আল্লাহর হুকুমের প্রতি বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ কোরবে তারাই মোসলেম, তার বংশপরিচয় এখানে বিবেচ্য নয়। তাই উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ পাকের কথা ও তাফসীরকারকদের ব্যাখ্যার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কেয়ামতের পূর্বে সমগ্র মানবজাতি স্রষ্টার সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ কোরবে এবং মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরে একজাতিতে পরিণত করার জন্যই ঈসা (আ:) এর পুনরাগমন হবে। সুতরাং এটাই যদি তাঁর কাজ হয় তবে কেন আমরা মিছেমিছি সেই ঐক্যকে বিলম্বিত কোরছি, আজই কেন আমরা এক জাতিতে পরিণত হোতে পারছি না? যেহেতু ঈসা (আ:) এসে বাইবেলে বর্ণিত Anti-Christ, The Beast, হাদীসে বর্ণিত দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরবেন যার ফলস্বরূপ পৃথিবী হবে Kingdom of Heaven, সেহেতু আমরা সেই ঐক্যপ্রক্রিয়া এখনই কেন শুরু কোরি না?

এটা প্রসিদ্ধ ইতিহাস যে, রসুলাল্লাহ মক্কা বিজয়ের পর যখন কাবা ঘরে স্থাপিত বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি ভেঙে ফেলছিলেন তখন কাবার অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে যিশু খ্রিস্ট ও মাতা মেরির ছবিও ছিল। আল্লাহর রসুল সকল মূর্তি ভাঙলেও, সকল ছবি ধুয়ে ফেললেও ঐ ছবিটা নষ্ট কোরলেন না। কয়েক শতাব্দী ঐ ছবি সেখানেই ছিল। পরে কাবাঘর পুনসংস্কার করার সময় সেই ছবিগুলি নষ্ট হোয়ে যায় (সূত্র: সিরাত ইবনে ইসহাক)। যে ছবি আল্লাহর ঘর ক্বাবায় ছিল সে ছবি কারও ঘরে কেউ যদি রাখতে চায় তবে অন্যের আপত্তি থাকবে কেন? তিনি তো কেবল খ্রিস্টানদেরই নবী নন, মোসলেমদেরও নবী। নবী-রসুলগণ কোনো নির্দিষ্ট জাতির একার সম্পদ হোতে পারেন না। তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। তাঁরা যে বিধান এনেছেন স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলোতে শরিয়াহর কিছু রদ-বদল থাকলেও মূল শিক্ষায় কোনো পার্থক্য ছিল না। কারণ, পৃথিবীর সত্য, শাশ্বত, সনাতন নিয়ম-নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই শাশ্বত শিক্ষা যেমন আল কোর'আনে আছে, তেমন বাইবেলেও আছে। কাজেই মোসলেমরা কোর'আনের পাশাপাশি বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ কোরবেন, ইঞ্জিলের বহু কথা আল্লাহ কোর'আনেও উল্লেখ কোরেছেন। খ্রিস্টানরা বাইবেলের পাশাপাশি কোর'আন থেকে শিক্ষাগ্রহণ কোরবেন এমনটাই হওয়া উচিৎ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মোসলেম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কার্যত হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ, হানাহানি তথা শত্রুতার যুক্তিসঙ্গত ধর্মীয় কোন কারণ নেই।

তাছাড়াও এব্রাহীম (আ:) তথা আব্রাহাম কে মোসলেমরা যেমন জাতির পিতা বোলে মান্য করেন। আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীর উদ্দেশে পবিত্র কোর'আনে বোলছেন, "এটাই (এসলাম) তোমাদের পিতা এব্রাহীমের দীন। আল্লাহ্ তোমাদের নাম রেখেছেন "মুসলিম"। পূর্বের গ্রন্থাবলীতেও আবার এই গ্রন্থেও (কোর'আন) ঐ নামই দেয়া হোয়েছে। (সুরা আল-হাজ্জ ৭৮)।

তেমনি খ্রিস্টানরাও তাঁকে জাতির পিতা বোলেই মান্য করেন। বাইবেলে বলা হোচ্ছে: Abraham is "the father of all those who believe", both of the circumcised and the uncircumcised (Rom 4:9-12). অর্থাৎ আব্রাহাম খাৎনাকারী এবং খাৎনা বিহীন নির্বিশেষ সকল বিশ্বাসী মানুষের পিতা। ঈসা (আ:) তাঁর অনুসারীদের বোলছেন, "If you were Abraham's children, then you would do what Abraham did. (John 8:39) অর্থাৎ যদি তোমরা এব্রাহীমের সন্তান হোয়ে থাকো তবে সেই কাজই তোমাদের কর্তব্য যা এব্রাহীম কোরেছেন। সুতরাং এদিক দিয়েও মোসলেম খ্রিস্টান একই পিতার দুই পুত্র।

এই যদি হয় মোসলেমদের সাথে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক তাহলে এ দুই জাতির মধ্যে এত বিভেদ কেন? আমরা কি আজও এক সাথে বসতে পারি না? শত শত বছর ধরে বহু সংঘাত হোয়েছে, শত্রুতা হোয়েছে, ক্রুসেড সংঘটিত হোয়েছে, কিন্তু কী লাভ হোয়েছে? শান্তি এসেছে কি? শান্তি তো আসেই নি, মাঝখান থেকে ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানবতাটাই হারিয়ে গেছে। তাই আসুন আমরা একসাথে বসি, আমরা ভাই ভাই হোয়ে যাই। যে নবী-রসুলগণ একজন আরেকজনকে ভাই বোলে সম্বোধন কোরেছেন, সেই নবীদের অনুসারী হোয়ে আমরা কেন একে অপরের সাথে শত্রুতা কোরবো?

ঈসা (আ:) সম্পর্কে আল্লাহর শেষ রসুল (দ:) বোলেছেন, "মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে ঈসা ইবনে মারিয়ামের (আ:) ভাই হবার ক্ষেত্রে আমি সর্বাধিক দাবিদার, তাঁর ও আমার মধ্যে আর কোন নবী নেই" (কানজুল উম্মাল, ১৭ খণ্ড, হাদিস ১০৩৩)। অন্যত্র বোলেছেন, "দুনিয়ায় এবং আখেরাতে আমি ঈসা ইবনে মারিয়ামের (আ:) সবচেয়ে নিকটতম। সকল নবীরাই ভাই ভাই, কেবল তাদের মা আলাদা। তবে তাদের সবাই একই ধর্মের অনুসারী। (হাদীস- আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী)। আবার ঈসা (আ:) শেষ নবীকে কতখানি সম্মান কোরেছেন তা বাইবেলে বর্ণিত আছে। ঈসা (আ:) তাঁর আসহাবদেরকে বোলেছেন, "বিশ্বাস করো আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে সম্মান জানিয়েছি। এভাবে সকল নবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁর রূহকে দর্শনের মাধ্যমে নবীগণ নব্যুয়তপ্রাপ্ত হোয়েছেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম আত্মা প্রশান্ত হোয়ে গেল। আমি বোললাম,

O Muhammad;, God be with you, and may he make me worthy to untie your shoelatchet; for obtaining this I shall be a great prophet and holy one of God. হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমাকে তিনি আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান কোরুন। কারণ আমি যদি এই মর্যাদা লাভ কোরি তাহলে আমি একজন বড় নবী হবো এবং আল্লাহর একজন পবিত্র মানুষ হোয়ে যাবো। (The Gospel of Barnabas, Chapter 44)". এই ছিল একজন নবীর নিকটে অপর একজন নবীর সম্মান, মর্যাদা। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, নবী-রসুল-অবতারগণ একে অপরকে কতখানি সম্মান কোরতেন, ভালোবাসতেন। অথচ তাদেরই অনুসারী দাবি করে আমরা জেহাদ-ক্রুসেডের নামে একে অপরের সাথে বংশ পরম্পরায় শত্রুতা কোরে যাচ্ছি, মসজিদ গুড়িয়ে দিচ্ছ, উপাসনালয় ভাঙছি, মূর্তি ভাঙছি, দাঙ্গা কোরছি, রক্তপাত কোরছি। কী নিষ্ঠুর পরিহাস।

খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হোয়ে থাকে কোর'আনে বহু আয়াত আছে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। এটা একটা বিভ্রান্তি। বস্তুত কোর'আনে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কোনো আয়াত নেই। কোর'আনে বলা আছে- তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে। আর মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদেরকে নিকটে পাবে যারা বলে, 'আমরা নাসারা (খ্রিস্টান)' (মায়েদা, ৮২)।

নাজ্জাশী ছিলেন খ্রিস্টান শাসক। তিনি রসুলাল্লাহকে সত্য প্রচারে সহযোগিতা কোরেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত এসলাম গ্রহণ কোরেছেন বোলে কোনো সহিহ হাদিস বা ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এসলাম গ্রহণ না কোরলেও রসুলাল্লাহ তাঁকে একজন মোসলেমের সম্মানে সম্মানিত কোরেছেন। তাঁকে মোসলেমদের ভাই হিসেবে উল্লেখ কোরেছেন।

নাজ্জাশী ইন্তেকাল কোরেছিলেন তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে। আল্লাহর রসুল নাজ্জাশীর এন্তেকালের তারিখেই তার মৃত্যু সংবাদ সাহাবাদের জানান এবং জামায়াতবদ্ধ হোয়ে গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করেন। তিনি সাহাবাদেরকে বলেন- 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড় যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ কোরেছেন।' নাজ্জাশী যে মোসলেম ছিলেন না তার সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল পাওয়া যায় এখানেই। রসুলাল্লাহ যখন জানাযায় দাঁড়ালেন তখন কয়েকজন মোনাফেক মন্তব্য করে যে, রসুলাল্লাহ একজন কাফেরের জানাযা পড়াচ্ছেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুরা আল ইমরানের ১৯৯ নং আয়াত নাজেল কোরলেন, যেখানে বলা হোয়েছে- 'আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রোয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হোয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রোয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন।' নাজ্জাশী যে মোসলেম ছিলেন না, আহলে কিতাব অর্থাৎ খ্রিস্টান ছিলেন এবং আহলে কিতাবরাও দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করে মোসলেমদের সমান মর্যাদার অধিকারী হোতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই আয়াতটিই। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোচ্ছে নাজ্জাশী ধর্মব্যবসায়ী ছিলেন না, ধর্মকে তিনি স্বার্থ হাসিলের মাধ্যমে পরিণত করেন নি। প্রায় সকল মোফাসসের ও হাদিস বিশারদগণ স্বীকার কোরেছেন যে, এই আয়াতটি নাজ্জাশীর মৃত্যু ও মোনাফেকের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত নাজেল হোয়েছিল।

এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহর শেষ রসুল তাঁর জাতির জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন যে, তোমরা একে অপরের শত্রু নও, আলাদা নও, তোমরা যাঁদের অনুসারী তাঁরা একই স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত, সুতরাং অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তির প্রাচীর তুলে রাখার কোন বৈধতা নেই, যুক্তিও নেই। এই ছিল মোসলেমদের সাথে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক। প্রশ্ন হোতে পারে, তাই যদি হবে তাহলে পরবর্তীতে তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরলেন কেন?

পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের সাথে মোসলেমদের যে যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায় তার পেছনে বহু কারণ নিহিত রোয়েছে। প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। রসুলাল্লাহ যখন মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান, তখন মক্কাবাসী মোশরেকরা পৃথিবী থেকে সত্যদীনকে মুছে ফেলার অভিপ্রায় নিয়ে অনেকবার তাঁকে আক্রমণ কোরেছে। সে আক্রমণে যারা যারা সাহায্য কোরেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি পরবর্তীতে অভিযান পরিচালনা কোরেছেন। সেটা ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেটা কোনো আন্তঃধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না। পবিত্র জেরুসালেম শহর মোসলেম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা:) ঘুরে ঘুরে শহরের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখার সময় যখন খ্রিস্টানদের একটি অতি প্রসিদ্ধ গির্জা দেখছিলেন তখন সালাতের সময় হওয়ায় তিনি গির্জার বাইরে যেতে চাইলেন। জেরুজালেম তখন সবেমাত্র মোসলেমদের অধিকারে এসেছে, তখনও কোন মসজিদ তৈরিই হয় নি, কাজেই সালাহ খোলা ময়দানেই কায়েম করা হতো। জেরুজালেমের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ সোফ্রোনিয়াস ওমরকে (রা:) অনুরোধ কোরলেন ঐ গির্জার মধ্যেই তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নামাজ পড়তে। ভদ্রভাবে ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কোরে ওমর (রা:) গির্জার বাইরে যেয়ে সালাহ কায়েম করলেন। কারণ কি বোললেন তা লক্ষ্য কোরুন। বললেন- আমি যদি ঐ গির্জার মধ্যে নামাজ পড়তাম তবে ভবিষ্যতে মোসলেমরা সম্ভবতঃ একে মসজিদে পরিণত কোরে ফেলতো। একদিকে এসলামকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত কোরতে সর্বস্ব পণ কোরে দেশ থেকে বেরিয়ে সুদূর জেরুজালেমে যেয়ে সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসলাম প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে খ্রিস্টানদের গির্জা যেন কোন অজুহাতে মোসলেমরা মসজিদে পরিণত না করে সে জন্য অমন সাবধানতা। উম্মতে মোহাম্মদী যতো যুদ্ধ কোরেছিলো সেগুলির উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা (আজ যেমন জাতীয়ভাবে ব্রিটিশের আইন-বিধান মেনে নেওয়া হোয়েছে)। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তার ধর্ম ত্যাগ কোরে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোন অসুবিধা পর্যন্ত না কোরতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিই। আমর ইবনুল আস (রা:) এর মিসর বিজয়ের পর আলেকজান্দ্রিয়ায় কে একজন একদিন রাত্রে যিশু খ্রিস্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রিস্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা ধরে নিলো যে, এটা একজন মোসলেমেরই কাজ। আমর (রা:) সব শুনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন কোরে তৈরি কোরে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিস্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিলো অন্যরূপ। তারা

বললো, "আমরা চাই আপনাদের নবী মোহাম্মদের (দঃ) প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনিভাবে তাঁর নাক ভেঙ্গে দেব।"

এ কথা শুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন আমর (রাঃ)। প্রাণপ্রিয় নবীজির প্রতি এত বড় ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি দেখে তাঁর ডান হাত তলোয়ার বাটের উপর মুষ্টিবদ্ধ হয়। ভীষণ ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংবরণ কোরে নিয়ে বোললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি।" পরদিন খ্রিস্টানরা ও মোসলেমরা বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হোল। আমর (রাঃ) সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বোললেন, "এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের ধর্মের হোয়েছে, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাক কেটে দিন।" এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রিস্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মোসলেম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বললো, "থামুন! আমি ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। অতএব আমার নাক কাটুন।" বিজিতদের উপরে বিজয়ীদের এই উদারতায় ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হোয়ে সেদিন শত শত খ্রিস্টান এসলাম কবুল কোরেছিলেন।

সুতরাং উম্মতে মোহাম্মদীর যুদ্ধগুলি ছিল রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। খ্রিস্টান শাসকরা যুদ্ধগুলোর মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার কোরেছেন, যেমন বর্তমানে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যাবহার করা হচ্ছে। মুসা (আঃ) যুদ্ধ কোরেছেন ফেরাউনের বিরুদ্ধে, কৃষ্ণ (আঃ) যুদ্ধ কোরেছেন আপন মামা কংসের বিরুদ্ধে, যুধিষ্ঠির (আঃ) যুদ্ধ কোরেছেন আপন চাচার বিরুদ্ধে, আখেরী নবীও যুদ্ধ কোরেছেন আপন চাচার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ বহু নবীকেই যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে। কারণ একটাই- অসত্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ঘৃণা, তারপর প্রতিবাদ, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে। এটাই সনাতন রীতি। রসুলাল্লাহ ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীরা মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবী অধিকার কোরেছিলেন। বস্তুত অন্যায়-অবিচার, অশান্তি নির্মূল কোরে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য, কোনো জাতি বা ধর্মকে আঘাত করা নয়।

বর্তমানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন স্রষ্টা কেবল আমাদের সাথেই আছেন। আমরা স্রষ্টার প্রিয় জাতি, অন্যরা অবাধ্য, তারা নরকে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে স্রষ্টা আমাদের কারও প্রতিই খুশি নন। মানুষে মানুষে বিভেদের অভেদ্য প্রাচীর তৈরি কোরে এবং মানবতাকে উপেক্ষা কোরে নিত্য অশান্তির সৃষ্টি কোরে আমরা নিজেদের হাতেই আল্লাহর অভিশাপ ক্রয় কোরে নিয়েছি। এখন প্রতিনিয়ত তার ফল ভোগ কোরছি। কিন্তু স্রষ্টার অপার মহিমা যে, তিনি এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে এ অভিশাপ থেকে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছেন। তাই আসুন আমরা ভাই ভাই হোয়ে যাই। সকল প্রকার অনৈক্যকে পেছনে ফেলে নবী-রসুল-অবতারদের প্রকৃত শিক্ষা মোতাবেক ঐক্যবদ্ধ হোই। নিজ নিজ ধর্মের সত্য ও শাশ্বত বিধানের আশ্রয় গ্রহণ কোরে স্রষ্টাহীন, বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের সৃষ্ট অশান্তির অনল থেকে নিজেদের মুক্ত কোরি। ■

ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসুন

রাকীব আল হাসান

অন্ধত্ব বা দৃষ্টিহীনতা (Blindness) কী? অন্ধত্ব হলো না দেখা, না বোঝা, নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, এর বাইরে চিন্তা না করা, গবেষণা না করা। পৃথিবীতে শুধু আমিই ঠিক। কাজেই এর বাইরে আর কোন কিছুই দেখবো না, জানবো না, শুনবো না। পৃথিবীতে শুধু ধর্মের জ্ঞানই প্রয়োজনীয়, আর আমার সে ব্যাপারে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে, কাজেই এর বাইরে অন্য কোনো জ্ঞানের দরকার নেই। আমি যা জানি তাই সত্য, পৃথিবীতে আর কোনো সত্য নেই। স্বর্গে শুধুমাত্র আমিই যাব, আর কেউ যাবে না- এসবই হলো অন্ধত্ব। প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরাই মনে করেন যে তাদের ধর্মই সঠিক, একমাত্র তারাই সঠিক পথে আছে। স্বর্গে, জান্নাতে, হ্যাভেনে যাবার পথ শুধু তাদেরই জানা, কাজেই মুক্তির জন্য সকলকেই তাদের স্মরনাগত হতে হবে। বাকি সকল ধর্মই ভ্রান্ত, অসত্য। সুতরাং যে যত ধর্মই পালন করুক অন্য ধর্মের অনুসারী মাত্রই বিধর্মী অর্থাৎ জাহান্নামী। বিকৃত এসলামের মোসলেমরা মনে করছে জান্নাতে যাবার অধিকার একমাত্র তাদের। জান্নাতে যাবার পূর্ব শর্তই হলো বর্তমানে এসলাম নামে যে ধর্মটি চালু আছে তা গ্রহণ করা। অন্য যেকোন ধর্ম যত যত্নসহকারেই পালন করা হোক তাকে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আবার হিন্দুরা ভাবছেন হিন্দুধর্মই স্বর্গলাভের একমাত্র পথ। হিন্দুরা ছাড়া কেউই স্বর্গে পৌঁছতে পারবে না। খ্রিস্টানরা ভাবছে স্বর্গের 'Eternal life' এ শুধুই তাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এই মানসিকতাগুলি নিছক ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছাড়া কিছু নয়। প্রত্যেক ধর্মেই নিজেদের স্বার্থে ধর্মের ধারক বাহক সেজে একটি ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি তাদের এই সংকীর্ণ মানসিকতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত কোরে অব্যাহতভাবে জগৎসংসারের অকল্যাণ

কোরে চলেছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ধর্মীয় বিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা, দাঙ্গা, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত কোরে তারা ধর্মকে বানিয়ে নিয়েছে বাণিজ্যের মূলধন, স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। তারা নানা ইস্যুতে অন্য ধর্মকে কটাক্ষ কোরে কথা বলে, অন্য ধর্মের নবী-রসুল, অবতার, মহামানবদের ব্যাপারে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার কোরে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ায়। সাধারণ মানুষ ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য, ধর্মীয় নানা কার্য সম্পাদনের জন্য এই শ্রেণিটির শরণাপন্ন হয়। এরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজেদের মনগড়া কথা ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ তাদের কথায় প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর পেছনে এরাই মূলত রসদ যুগিয়েছে। এদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অন্য ধর্মকে ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক জ্ঞান কোরে মহামানবদের ব্যাপারে যখন অসত্য, মন্দ বাক্য বিনিময় করে তখনই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সূত্রপাত ঘটে। শুধু তাই নয়, এদের অন্ধত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা যখন বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মে স্রষ্টা প্রেরিত নবী-রসুল, অবতার, মহামানবদের নিয়ে আলোচনা আমাদের পত্রিকায়, লেখনিতে তুলে ধরছি তখন এই শ্রেণিটি অপপ্রচার কোরছে এটা খ্রিস্টানদের পত্রিকা, এটা বিধর্মীদের পত্রিকা, এই পত্রিকা যেন কেউ স্পর্শ না করে, স্পর্শ করলে তার ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ বলেছেন- 'যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।' (সুরা যুমার-১৮)। আল্লাহ মনোযোগ সহকারে সব বিষয় শুনতে বোলেছেন, যাচাই কোরতে বোলেছেন, অতঃপর যেটা উত্তম সেটা গ্রহণ কোরতে বোলেছেন। কিন্তু এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা আল্লাহর এই কেতাবগুলোকে সংকীর্ণ, কূপমণ্ডুক দৃষ্টিহীন কোরে ফেলেছে। কারো মনের উপর জোর চলে না, আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন আমাদের কথাগুলি যদি বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য, উত্তম এবং যৌক্তিক মনে হয় তাহোলে আপনারা সেটা গ্রহণ করুন। গ্রহণ বা বর্জন করা একান্তই আপনাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমরা শুধু উপস্থাপন করছি মাত্র। সাধারণ মানুষকে আজ এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা অন্ধ কোরে রেখেছে। ধর্মব্যবসায়ীরা কোনো কথা বললে সেটা সত্য কি মিথ্যা সাধারণ জনগণ তা যাচাই করে না। কিন্তু আপনারা অবশ্যই সেটাও যাচাই করবেন। কারণ এটা স্রষ্টার নির্দেশ।

একটা বিষয় সকলকে অনুধাবন করতে হবে- এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা নিশ্চয় সংকীর্ণ নন। যাঁর সৃষ্টি এত অসীম, তাঁর নিজের বিরাটত্ব কতটা অসীম এবং নিখুঁত! কাজেই তাঁর নিকট থেকে আগত ধর্মও বিশাল, উদার, ত্রুটিমুক্ত। সকল ধর্মই সেই মহান স্রষ্টার নিকট থেকে আগত। সকল ধর্মের মূল বাক্য একই, মৌলিক শিক্ষাগুলি অভিন্ন। আপনি কোন ধর্মের অনুসারী এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, আপনি আপনার ধর্মের মূল বাক্যে, মৌলিক শিক্ষার মধ্যে আছেন কি না সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে চান, পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্য তথা কিংডম অব হ্যাভেন বানাতে চান, সত্যযুগ ফিরিয়ে আনতে চান, পৃথিবীকে জান্নাতে পরিণত করতে চান মৃত্যুর পরও যদি জান্নাত, স্বর্গ তথা হ্যাভেনে যেতে চান তবে আপনাদেরকে নিজ নিজ ধর্মের মৌলিক শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে হবে। আপনাকে জানতে হবে সেই মৌলিক শিক্ষাগুলি কী? মূল বাক্য কোনটি? এক কথায় স্বর্গে, জান্নাতে তথা হ্যাভেনে যাবার প্রকৃত উপায় কী?

সকল ধর্মের মূল বাক্য হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্রষ্টা ঈশ্বর তথা আল্লাহর হুকুমের যথাযথ বাস্তবায়ন। মানবরচিত ভোগবাদী, জড় ও বস্তুবাদী, স্রষ্টাহীন সকল তন্ত্র-মন্ত্র প্রত্যাখ্যান কোরে স্রষ্টার দেওয়া বিধান সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ। এটাই সকল ধর্মের মূল বাক্য। অর্থাৎ জান্নাতে যাবার পূর্ব শর্তই হলো জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে স্রষ্টার হুকুমের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, যুলুম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, রক্তপাত, অশান্তি দূর কোরে অনাবিল শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। স্বর্গে কারা যাবে এর এক কথায় উত্তর হোল, যারা একমাত্র স্রষ্টার এবাদত কোরবে। আর স্রষ্টার এবাদত হোচ্ছে মানবজাতির শান্তির জন্য সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজ না কোরে যত উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা, পূজা, অর্চনা, নামাজ রোজাই করা হোক না কেন সেগুলি কোনটাই এবাদত হিসাবে কবুল হবে না, মনুষ্যকে স্বর্গে নিতে পারবে না।

আর সকল ধর্মের মৌলিক শিক্ষা হলো মানুষের অভ্যন্তরস্থ মানবীয় গুণাবলীকে জাগ্রত করা। দয়া, মায়া, ভালোবাসা, মনুষ্যত্ব, মানবতা, সৌহার্দ্যতা, বিবেক, সহমর্মিতা, পরদুঃখকাতরতা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, ঐক্য, শৃঙ্খলা, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অপরকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি হলো মানবীয় গুণাবলী, এই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন হারিয়ে যায় তখন সে আর মানুষ থাকে না। তার কোনো ধর্ম থাকে না। সে তখন ধর্মহীন হয়ে যায়। সে তখন পশুতে পরিণত হয়। সে যে ধর্মের ধ্বজাধারীই হোক না কেন এই গুণাবলী যদি তার মধ্যে না থাকে তবে সে মানুষ্য রূপধারী পশু।

আমরা যামানার এমামের অনুসারী হেযবুত তওহীদের সদস্য সমগ্র মানবজাতিকে সকল ধর্মের সেই মৌলিক শিক্ষার দিকে ফিরে আসার আহ্বান করছি। আসুন আমরা সকল সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসি। মানবতার কল্যাণে, মানবজাতির মুক্তির জন্য, সমগ্র মানবজাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করি। আমরা সকলে ভাই ভাই, একটি পরিবার হয়ে যাই। ■

কেন উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি ও উত্থান হোয়েছিল, কেমন ছিলেন সেই বিশ্বজয়ী উম্মাহ, কি ছিল তাদের আকীদা, আর আজ কেন সেই জাতি বিশ্বের সকল জাতির গোলাম? কিভাবে এই গোলামি থেকে জাতির পরিত্রাণ ঘোটবে এমন সব যুগান্তকারী প্রশ্নেরই কোর'আন, হাদিসভিত্তিক অখণ্ডনীয় জবাব পেশ করা হোয়েছে এই বইটিতে।

এসলামের প্রকৃত রূপরেখা

প্রসঙ্গ: কল্কি অবতার, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য

আসুন বিচ্ছেদের রাস্তা পরিহার করে সংযোগের রাস্তা খুঁজি

হেযবুত তওহীদ

আমরা পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে, সাপ্তাহিক সংকলনে ও ডকুমেন্টারিগুলোতে সেই সকল বিষয় আলোকপাত কোরেছি যেগুলোর ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হোতে পারে। আমরা যে কথাই বলি, যে বিষয়েই আলোকপাত করি না কেন তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ঐক্যবদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি পৃথিবী গঠন করা। কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মাহাত্ম বর্ণনা করাও আমাদের অভিপ্রায় নয়, কারণ প্রতিটি প্রধান প্রধান ধর্মের মাহাত্ম বর্ণনা করে চলেছে সে ধর্মের লক্ষ-কোটি অনুসারী এবং পণ্ডিত, আলেম-পুরোহিতরা। কাজেই নতুন করে মাহাত্ম বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। ধর্মের পরিধি বিস্তৃত। তাই এক ধর্মের সাথে অপর ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করাও আমাদের অভিপ্রায় নয়। সেটা অর্থহীনও বটে। কারণ, পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের নিজেদের মধ্যেই রোয়েছে বিস্তর মতভেদ বা বিতর্ক। তাই ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ কোরলে কেবল বিতর্ক ও পরিণামে অনৈক্যই বৃদ্ধি পাবে, যা আমাদের কাম্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হোল অনৈক্যের অবসান কোরে ঐক্যের ঝাণ্ডা উড়ানো। তাই আশা রাখি- পাঠক আমাদের প্রকাশনাগুলো উদার মনে যাচাই কোরবেন। উত্থাপিত বক্তব্যের সাথে যদি কারও কোনো দ্বিমত থাকে তাহলে মানবজাতির উপকারার্থে আমাদেরকে সে বিষয়ে অবগত কোরবেন। ইতোমধ্যেই অনেক পাঠক আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উত্থাপিত কিছু বিষয়ের সাথে তাদের মতদ্বৈততা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করে কৃতার্থ করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কল্কি অবতার প্রসঙ্গে। বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর কল্কি অবতার হবার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক পাঠক তাদের স্ব স্ব মতামত জানিয়েছেন। বস্তুত আখেরী নবী কল্কি অবতার কিনা সেটা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। তাঁকে কল্কি অবতার প্রমাণ করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ মহানবীকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে প্রায় ১৬০ কোটি মোসলেম। কিন্তু তাতে কী লাভ হোয়েছে? মোসলেম নামধারী জাতিটি আজ মহানবীর প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে অশান্তির চিতায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে। কাজেই রসুলাল্লাহকে কল্কি অবতার প্রমাণ করার মধ্যে কোনো মাহাত্ম নেই। আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানগুলোকে তুলে ধরেছি মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই সে বিষয়গুলোরও পাল্টা মতামত রোয়েছে। অনেকেই মনে করেন মোহাম্মদ (দ) কল্কি অবতার নন, কল্কি অবতার আরেকজন। আবার অনেকের মতে কল্কি অবতার এখনও আসেন নি। তবে প্রকৃত ঘটনা যাই হোক আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় যেহেতু সেটা নয় কাজেই এই বিষয়টি আমাদের ঐক্যের ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না এমনটাই আশা কোরি। আমরা বিতর্কমূলক বিষয়গুলোকে সর্বান্তকরণে পরিহার কোরে কোন পথে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারি সে পথকেই তুলে ধরার চেষ্টা কোরছি। কারণ বিতর্ক ও মতভেদে পৃথিবী আজ জর্জরিত। আমরা সর্বদাই বিচ্ছেদের রাস্তা পরিহার কোরে সংযোগের রাস্তা খুঁজি। তারপরও যদি আমাদের কোনো বক্তব্যে কারও কোনো দ্বিমত থাকে তাহলে তাদের বক্তব্য আমাদেরকে লিখিতভাবে জানালে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হবো।

ভারতবর্ষে আগত শ্রীকৃষ্ণকে অনেকে অবতার হিসেবে নয়, বরং স্বয়ং স্রষ্টা বলে মনে করেন। এখানেও আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। তাঁকে অবতার বা স্রষ্টা হিসেবে প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের কথা হলো তিনি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরে গেছেন, যে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরে গেছেন তাঁর অনুসারীরা যদি তাঁর সেই শিক্ষাকে গ্রহণ কোরে সেই ন্যায় ও শান্তির পথে ফিরে আসে তাহলেই তাঁর আগমন স্বার্থক হবে। আমরা ঐ ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি। তার জন্য প্রয়োজন স্রষ্টার বিধানের অধীনে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমরা মনে করি, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একমাত্র স্রষ্টার নির্দেশিত পথে চললেই মানবজাতি শান্তি পাবে, মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। কাজেই সেই বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে কোনো আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার অবকাশ এখন নেই। আমরা যামানার এমামের অনুসারীরা সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো আপাত অসম্ভব কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। এই কাজে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। কোনো কথায় কোনো একটা সম্প্রদায়ের যদি আপত্তি থেকে থাকে, তাহলে আপনারা আমাদেরকে অবগত কোরবেন। আমরা অবশ্যই সে বিষয়কে বিবেচনা করবো। আমরা ঐক্য চাই, শান্তি চাই। আমরা মানবজাতি একই স্রষ্টা থেকে আগত। এক পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। সুতরাং আমরা এক পরিবার, প্রত্যেকে ভাই বোন। ■

দাজ্জাল কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, একটি বর্বর 'সভ্যতা'র নাম

বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দঃ) বোলেছেন, আখেরী যামানায় বিরাট বাহনে চোড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে; তার নাম দজ্জাল। সে আল্লাহর বদলে নিজেকে মানবজাতির প্রভু (রব) বোলে দাবী কোরবে (হাদীস- বোখারী)। দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। যারা তাকে প্রভু বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে তার জান্নাতে স্থান দেবে। (হাদীস- বোখারী, মোসলেম)। তার কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। যারা তাকে রব বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে সেখান থেকে দান কোরবে। আর যারা তাকে রব বোলে অস্বীকার কোরবে, অর্থাৎ তার আদেশ মতো চোলবে না, তাদের সে তার ভাণ্ডার থেকে দান তো কোরবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) ও অবরোধ (Embargo) আরোপ কোরবে। তার পদতলে সমগ্র মোসলেম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে (হাদীস- বোখারী, মোসলেম)। মহানবী (দঃ) এই দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বোলে চিহ্নিত কোরেছেন (হাদীস- মোসলেম), শুধু তা-ই নয়, এর মহাবিপদ থেকে তিনি নিজে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (হাদীস- বোখারী)। বিশ্বনবী (দঃ) বর্ণিত সেই ভয়ঙ্কর একচোখা দানব 'দাজ্জাল' এসে গেছে! আল্লাহর অশেষ করুণায় হেযবুত তওহীদের এমাম, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সেই দাজ্জালকে চিহ্নিত কোরেছেন। তিনি রসুলাল্লাহর (দঃ) হাদিস, বাইবেল, বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ কোরেছেন যে, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদি খ্রিস্টান যান্ত্রিক 'সভ্যতা'ই হোচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত সেই ভয়ঙ্কর দানব দাজ্জাল, যে দানব ৪৭৭ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হোয়েছে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত কোরে চোলেছে; আজ মোসলেমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভু বোলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে।

মানবজাতি আজ এমন একটি সভ্যতাকে নিজেদের জীবনে ধারণ কোরে আছে যার সঙ্গে স্রষ্টা, আল্লাহ বা ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। এই আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কোরে দিয়েছে, এখন সে শারীরিকভাবেও মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। এই ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'-ই হলো রসুলাল্লাহ বর্ণিত এক চক্ষুবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর দানব দাজ্জাল। তবে এটি পরিষ্কার বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' তথা দাজ্জাল কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় জাতি বা গোষ্ঠী নয়, দাজ্জাল একটা 'সভ্যতা'র নাম। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে দাজ্জালের জন্ম হলেও সে ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মকেও প্রত্যাখ্যান কোরেছে। সে জাতীয় জীবন থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মসহ সকল ধর্মকেই পূর্ণরূপে নির্বাসন

দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ কোরেছে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে এখন এই পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা' তথা দাজ্জাল অশ্লীল ও অনৈতিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকেও ধর্মকে বিলুপ্ত করার প্রয়াস করে যাচ্ছে। এদেরকে ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' বলা হলেও মূলত এরা প্রকৃত ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরও চরম শত্রু। এই সভ্যতাটি সমগ্র মানবজাতিরই চরম শত্রু। এই দাজ্জালই বাইবেলে বর্ণিত 'এন্টি-ক্রাইস্ট'। কাজেই সমগ্র মানবজাতিকে আজ এই দাজ্জালের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইউরোপে যখন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও রাজাদের দ্বৈত শাসন নীতির ফলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তখন ধর্মের বিকৃতি রোধ না কোরে রাজ্য পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ধর্মকেই বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা মনে কোরল ধর্মই অশান্তির মূল। এ কারণে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টাহীন, ধর্মহীন, মনুষ্যত্বহীন, আত্মাহীন জড় ও বস্তুবাদী যে সভ্যতার জন্ম হোল তাকেই মাননীয় এমামুয্‌যামান দাজ্জাল বলে চিহ্নিত কোরলেন। এই সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জাল বুঝতে পেরেছিল যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস তাদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত যে একে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না, কাজেই সে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মকে যার যার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে নির্বাসন দিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের বৃহৎ পরিসর থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হোল। জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য তৈরি করা হোল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্রসহ নানা তন্ত্র-মন্ত্র। জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করার এই নীতি ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হোল বিশ্বব্যাপী। দাজ্জাল নানা প্রচার-প্রচারণা, কূটনৈতিক কলাকৌশল এবং সর্বশেষ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্রষ্টাহীন, ধর্মহীন, বস্তুবাদী এই তন্ত্র-মন্ত্র তথা সিস্টেমগুলি সমগ্র মানবজাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন সমগ্র মানবজাতিই দাজ্জালের তৈরি নানা তন্ত্র-মন্ত্র মেনে নিয়ে জাতীয় জীবনকে ধর্মহীন কোরে ফেলেছে। ফলে সমাজ পরিপূর্ণ হয়েছে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাতে।

সমগ্র মানবজাতির কাছে দাজ্জালের দাবি হলো তোমরা সামগ্রিক জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান কর, তবে ব্যক্তিগতভাবে চাইলে যার যার ধর্ম সে সে পালন করতে পার- এ ব্যাপারে আমার কোন বাধা নাই। জাতীয় জীবনে "আমাকে প্রভু বোলে স্বীকার করো।" অর্থাৎ আমি মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা দিচ্ছি, যে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা-ব্যবস্থা দিচ্ছি তা তোমরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করো। তোমরা বহু পুরাতন বেদ, মনু-সংহিতা, বাইবেল, তওরাত ও কোর'আন-হাদিস নিঃসৃত যে আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি জীবনে প্রয়োগ কোরছিলে তা পুরানো, অচল ও বর্বর; ওগুলো ত্যাগ কোরে আমি যে অতি আধুনিক আইন-কানুন দিচ্ছি তা গ্রহণ করো ও তোমাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগ করো। তাহলে তোমরা আমাদের মত সভ্য হবে, সমৃদ্ধশালী, ধনী ও শক্তিশালী হবে। তোমাদের জীবন-যাত্রার মান আমাদের মত উন্নত হবে। আমরা যেমন স্বর্গসুখে আছি তোমরাও এমনি স্বর্গসুখ ভোগ কোরবে। দাজ্জাল রব, প্রভু হবার দাবি কোরছে কিন্তু স্রষ্টা হবার দাবি কোরছে না। সে বলছে, ব্যক্তিগত জীবনে তোমরা হিন্দু, মোসলেম, খ্রিস্টান, ইহুদি, জৈন, বৌদ্ধ যা থাকতে চাও থাকো এবং যত খুশি তোমাদের আল্লাহকে, ঈশ্বরকে, গডকে, এলীকে ডাকো। যত খুশি নামাজ পড়ো, রোযা রাখ, হজ্ব করো, প্রার্থনা করো আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে আমার রবুবিয়াহ্, প্রভুত্ব মেনে নাও। এখানে তোমাদের স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান কোরে আমি যে জনগণের, একনায়কের, কোন বিশেষ শ্রেণির, সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ এক কথায় মানুষের সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি কোরেছি, তার যে কোন একটাকে মেনে নাও।

আজ মানবজাতি দাজ্জালের ঐ দাবি মেনে নিয়েছে এবং মেনে নেয়ায় দাজ্জাল মানবজাতিকে তার কাছে যে জান্নাতের মত জিনিসটি আছে তাতে প্রবেশ কোরিয়েছে। মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তাই আজ সমস্ত মানবজাতি জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে। সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। একটি মাত্র দম্পতি থেকে সৃষ্ট হোয়েও, একটিমাত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত হোয়েও (সুরা বাকারা, ২১৩; সুরা ইউনুস, ১৯; সুরা নেসা, ০১) মানুষ একে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কোরছে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নারীদের ধর্ষণ কোরছে। দাজ্জালের অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে কেউ কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হোয়ে জঘন্য বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ডুবে আছে আর কেউ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, খেতে পরতে দিতে না পেরে নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চা সন্তানদের হত্যা কোরে নিজেরা আত্মহত্যা কোরছে, মা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা কোরছে, পেটের সন্তান অন্যের কাছে বিক্রি কোরে দিচ্ছে; আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধি প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের দণ্ডবিধি গ্রহণ করায় সর্বরকম অপরাধ চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ, ছিনতাই, খুন-জখম, ধর্ষণ প্রতি দেশে, প্রতি জাতিতে ধাঁ ধাঁ কোরে বেড়ে চোলেছে; আল্লাহর দেয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ত্যাগ কোরে দাজ্জালের দেয়া আত্মাহীন, বস্তুবাদী, আল্লাহহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মানুষ তার নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষিত লোকদের দুর্নীতি আজ আসমান সমান হয়েছে।

এখানে বাইবেল থেকে দাজ্জাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে পর্যালোচনা করা যাক।

বাইবেলের নতুন নিয়মে (New Testament) ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে, পৃথিবীর শেষ সময়ে (Last hour) Anti-Christ আবির্ভূত হবে। Anti-Christ-এর শাব্দিক অনুবাদ হোচ্ছে খ্রিস্ট-বিরোধী। আমরা মনে কোরি এই Anti-Christ-ই বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) বর্ণিত দাজ্জাল। অবশ্য দাজ্জাল শব্দের অর্থ যেমন বর্তমানের ইহুদি-খ্রিস্টান জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতাকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে Anti-Christ শব্দটা ততটা করে না। দাজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে চাকচিক্যময় চোখ ধাঁধানো প্রতারক অর্থাৎ এমন একটি জিনিস যা মানুষের মন মগজকে বিমোহিত কোরে ফেলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ভেতরের রূপ ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ প্রতারণায় ভরপুর, এটি বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার নিখুঁত বর্ণনা। এই আত্মাহীন সভ্যতার যান্ত্রিক প্রযুক্তির উৎপাদিত বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তু মানুষের মনকে ধাঁধিয়ে ফেলে, কিন্তু ভেতরে আত্মা নেই বোলে এর অনুসারীদের মানবেতর জীবে পরিণত করে।

বাইবেলের চার জায়গায় Anti-Christ (খ্রিস্ট-বিরোধী বা যিশু-শত্রু) এর উল্লেখ আছে। আল্লাহর রসুল বর্ণিত দাজ্জালের সাথে বাইবেল বর্ণিত Anti-Christ-এর

সাদৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। উদ্ধৃতিগুলো New World Testament of the Holy Scriptures থেকে দেয়া হলো। Authorised of King James Version-এর সঙ্গে এর ভাষার কিছু পার্থক্য ছাড়া মূল বক্তব্যে কোন অমিল নেই।

১. তরুণ সন্তানগণ! এখন পৃথিবীর শেষ সময় এবং তোমরা শুনেছো যে, খ্রিস্ট- বিরোধী (যিশু-শত্রু) আসছে; ইতোমধ্যেই অনেক যিশু বিরোধী এসে গেছে যা থেকে আমরা জানতে পারছি যে এটাই শেষ সময় (আখেরী যামানা)।

বিশ্বনবীর বর্ণিত দাজ্জালের সঙ্গে এখানে দু'টি মিল পাচ্ছি। একটি দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় অর্থাৎ আখেরী যামানা (Last hour) দ্বিতীয়টি বিশ্বনবী নির্দিষ্ট দাজ্জালকে ছাড়াও অন্যান্য যালেম, প্রতারক, মিথ্যাবাদীকে কখনো কখনো দাজ্জাল বোলে অভিহিত কোরেছেন। যদিও আখেরী যামানার নির্দিষ্ট দাজ্জালের কথাও ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন। বাইবেলে একাধিক Anti-Christ ইতোমধ্যেই এসে গেছে বলা হয়েছে।

২. যে যিশুকে খ্রিস্ট বোলে অস্বীকার করে সে যদি মিথ্যাবাদী না হয় হতে মিথ্যাবাদী আর কে? সেই হোচ্ছে খ্রিস্ট-বিরোধী (যিশু-শত্রু) Anti-Christ যে পিতা (Father) এবং পুত্রকে (Son) অস্বীকার করে।

বিশ্বনবী দাজ্জালকে মিথ্যাবাদী বোলে বর্ণনা কোরেছেন এখানে বাইবেলে Anti-Christ সম্বন্ধে ঠিক সেই শব্দ ব্যবহার করা হোয়েছে- liar, মিথ্যাবাদী। বাইবেলে Anti-Christ কে মিথ্যাবাদী বলা হোয়েছে এই জন্য যে সে পিতা (God) ও পুত্রকে (Jesus) অস্বীকার কোরবে।

মনে রাখতে হবে খ্রিস্টানরা তাদের বিকৃত আকিদায় ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর ছেলে এবং উভয়কে একই সত্তা বোলে মনে করে। অর্থাৎ বাইবেলের কথায় বলা হোচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার কোরবে। মহানবী বোলেছেন দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব বোলে ঘোষণা কোরবে ও মানবজাতিকে বোলবে তাকে রব বোলে স্বীকার কোরে নিতে- অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার করতে।

৩. প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি যেটা স্বীকার করে যে যিশুখ্রিস্ট রক্ত-মাংসে আবির্ভূত হয়েছেন সেটা ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি যেটা যিশুকে স্বীকার করেন না সেটা, ঈশ্বরের নিকট থেকে আসে নাই। অধিকন্তু, সেটাই হোচ্ছে যিশু বিরোধীর, Anti-Christ's (প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি) ভবিষ্যতে যার আগমন সম্বন্ধে তোমরা শুনেছো, এবং সে ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে এসে গেছে।

বাইবেলের এই কথাগুলিতেও আমরা পাচ্ছি যে Anti-Christ ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে (which you have heard was coming) এবং সে যিশুকে অস্বীকার করবে। মহানবীর কথারই পুনরাবৃত্তি।

৪. অনেক প্রতারক পৃথিবীতে এসেছে যিশুখ্রিস্ট রক্ত মাংসে আবির্ভূত হয়েছেন এ কথা যারা স্বীকার করেন নাই। এরাই হচ্ছে প্রতারক, যিশু বিরোধী (Anti-Christ)।

বাইবেলের এই কথাগুলো বিবেচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর কেতাব বাইবেল (এনজিল) আর সে প্রকৃত বাইবেল নেই। মুসা (আ:) যে হিব্রু ভাষায় কথা বলেছেন সে ভাষাই নেই, বাইবেলও সে ভাষায় নেই। ঈসা (আ:) যে অ্যারামাইক ভাষায় কথা বোলতেন, সেই অ্যারামাইক ভাষায় লিখিত বাইবেল (এনজিল) পৃথিবীর কোথাও নেই (গত শতাব্দিতে Gospel of Barnabas অর্থাৎ ঈসার (আ:) ঘনিষ্ঠ সাহাবী বার্নাবাসের লিখিত বাইবেলটি তার কবর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে খ্রিস্টান পুরোহিত সমাজ সেটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি কারণ এ বাইবেলটিতে ঈসার (আ:) বক্তব্য অনেকগুলিই অবিকৃত অবস্থায় আছে, ফলে তা প্রচলিত বাইবেলগুলির সাথে বুনিয়াদি বিষয়গুলিতে সাংঘর্ষিক)। আদি বাইবেল প্রথমে গ্রীক, পরে ল্যাটিন (রোমান) ও পরে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হোয়ে অন্যরূপ ধারণ করেছে। বাইবেলের আদি একেশ্বরবাদ (তওহীদ) বিকৃত হোয়ে ত্রিত্ববাদে পরিণত হয়েছে। যেমন এবরাহীম (আ:) এর তওহীদ ভিত্তিক মিল্লাতে এবরাহীম অর্থাৎ দীনে হানিফ ক্রমে বিকৃত হয়ে আরবের পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়েছিলো। কাজেই Anti-Christ অর্থাৎ দাজ্জাল সম্বন্ধে বাইবেলের ভাষাও অবশ্যই বদলে গেছে। এতকিছু সত্ত্বেও বহু অনূদিত, বিকৃত বাইবেলেও চারবার উল্লেখ করা Anti-Christ সম্বন্ধে যে কয়টি বিষয় বলা হোয়েছে তার মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে বিশ্বনবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ক) আল্লাহর রসুল বোলেছেন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে আখেরী যামানায়। বাইবেল বোলছে Anti-Christ-এর আবির্ভাব হবে last hour-এ, অর্থাৎ আখেরী যামানায় (Acts: 1 Jo. 2:18, 4:3.)।

খ) মহানবী বোলেছেন দাজ্জাল আল্লাহকে অস্বীকার কোরে নিজে রব হবার দাবি কোরবে। বাইবেল বোলছে Anti-Christ পিতা (Father, God) ও পুত্রকে (Son, Jesus) অস্বীকার কোরবে (Acts: 1 Jo. 2:22, 4:3, 2 Jo 7.)।

গ) বিশ্বনবী দাজ্জালকে প্রতারক বোলেছেন। বাইবেলও Anti-Christ কে Deceiver (প্রতারক) বোলছে (Acts 2 Jo 7.)।

ঘ) আল্লাহর নবী দাজ্জালকে মিথ্যাবাদী (কায্যাব) বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন। বাইবেলও Anti-Christ কে Liar (মিথ্যাবাদী) বোলছে (Acts: 1 Jo 2:22.)।

এটি একটি বিরল ও নিষ্ঠুর পরিহাস যে, যে খ্রিস্টানরা (যদিও তখনও তারা সম্পূর্ণ হয় নি, আংশিকভাবে জুডাই অর্থাৎ ইহুদি ধর্মেই আছে) বাইবেলে যে Anti-Christ -এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কোরছেন এবং মানুষকে সে সম্বন্ধে সাবধান কোরে দিচ্ছেন, অথচ জানেন না তাদেরই কাজের ফলে Anti-Christ অর্থাৎ দাজ্জালের জন্ম হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরাই হবে Anti-Christ এর প্রথম সারির অনুসারী।

আজ এই অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য এক স্রষ্টার সৃষ্টি, এক পিতা-মাতার সন্তান সমগ্র মানবজাতিকে ন্যায়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাজ্জালকে প্রতিরোধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে দাজ্জাল সমগ্র মানবজাতির শত্রু। তার কোন ধর্ম নেই। দাজ্জাল সকল ধর্মকেই অস্বীকার করেছে। কাজেই আসুন যামানার এমামের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করি। ■

[দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী রচিত 'দাজ্জাল? ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'! বইটি সংগ্রহ কোরুন। যোগাযোগঃ হেযবুত তওহীদ, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থার ফলই হলো আজকের অনৈক্য

দীর্ঘ দু'শো বছর যে ঔপনিবেশিক শক্তিটি দাপটের সাথে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল শাসন করলো, বলা হোয়ে থাকে যে তারা এতদঞ্চলের মানুষদের চাপের মুখে বিতাড়িত হোয়েছে। বাস্তবতা হোচ্ছে এটা আংশিক সত্য মাত্র। মূলত এরা নিজেরা নিজেরা গত শতাব্দীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ কোরে ক্রমশ দুর্বল হোয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোতে তাদের শাসনের ব্যাপারে মানুষ বিদ্রোহীও হোয়ে উঠেছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে শক্তিটি অর্ধ-দুনিয়া শাসন করলো তারা অবশ্যই সর্বদিক দিয়ে সচেতন একটি জাতি। তাই তারা আগাম বুঝতে পেরেছিল তাদের ঔপনিবেশিক আমল শেষের দিকে, হয়তো এসব অঞ্চলকে আর বেশি দিন এভাবে দাবিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু ঐ সময়ের জন্য এটাও বাস্তব ছিল যে, তারা যদি চাইতো তাহলে জোর কোরে আরো বেশ কিছুটা সময় শাসন কোরতে পারতো। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় এগিয়ে থাকায় এই শক্তিটি আপসে এদেশীয় জনতার মধ্যে হোতে তাদের পছন্দনীয় একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আলগোছে সরে পড়ে। তারা জানতো শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। একদিন না একদিন তাদেরকে এই সব অঞ্চল থেকে বিদায় নিতেই হবে। তাই তারা নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য পূর্ব থেকেই একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কোরল।

প্রথমত তারা ঐ সময়ের সকল শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ কোরে নিজেদের সুবিধা মতো দুইটি ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু কোরল। এর একটি অংশ ধর্মীয় অংশ এবং অন্যটি সাধারণ শিক্ষা। উপমহাদেশের বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। এই মাদ্রাসায় এসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য খ্রিস্টান পণ্ডিতরা বহু গবেষণা কোরে একটি নতুন এসলাম দাঁড় করালেন যে এসলামের বাহ্যিক দৃশ্য প্রকৃত এসলামের মতোই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটার আকিদা এবং চলার পথ আল্লাহর রসুলের এসলামের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ তারা একটি বিকৃত এসলাম শেখানোর ব্যবস্থা করলো।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হোলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বের হোয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি কোরে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে। ব্রিটিশরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি কোরে উপার্জন কোরতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠির মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যায়। তারা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ কোরল। এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্মব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ কোরল এবং এর মাধ্যমে মোসলেমদের মধ্যেও অন্যান্য ধর্মের মতো একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কোরল। তারা ব্যস্ত হোয়ে পড়লো দীনের বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বাহাসে এবং নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হলো ফলে নিজেদের মধ্যে হাজারো বিভক্তি সৃষ্টি হতে থাকলো, ফলশ্রুতিতে এই জাতি ব্রিটিশ খ্রিস্টান প্রভুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেললো। এই পুরোহিত শ্রেণির কর্মকাণ্ডের ফলে তাদেরকে অনুসরণকারী বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠির চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হোলো, কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তা করারও শক্তি রোইল না। ফলে তারা চিরতরে নৈতিক মেরুদণ্ডহীন হোয়ে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মুখাপেক্ষি হোয়ে রোইল। আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু-মোসলেম অনৈক্য, বিভেদ, দাঙ্গা সূত্রপাতও ঘটে মূলত এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের পর থেকে।

যাইহোক, এভাবেই ব্রিটিশ খ্রিস্টান পণ্ডিতরা নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধোরে এই মোসলেম জাতিকে এই বিকৃত এসলাম শেখালো। অতঃপর তারা যখন নিশ্চিত হোলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত এসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হোয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হোতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিলো (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Faundation Bangladesh), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

বর্তমানে এসলামের ধ্বজাধারী যে ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণিটি ধর্মকে ব্যবহার কোরে ব্যবসা করছে, অপরাজনীতি করছে, জঙ্গিবাদ ও ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টি করছে তা মূলত ঐ ব্রিটিশদের তৈরি ষড়যন্ত্রমূলক মাদ্রাসা শিক্ষার ফসল। প্রকৃত এসলাম এটা স্বীকৃতি দেয় না। ব্রিটিশদের এই ষড়যন্ত্রের ফলেই এই উপমহাদেশে ধর্মীয় বিভেদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

অপরদিকে এই বিরাট এলাকা শাসন কোরতে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজ করার জন্য যে জনশক্তি প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মাধ্যমে সেই উপযুক্ত কেরাণী তৈরি করার বন্দোবস্ত করা হোলো। তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো। কিন্তু এখানে স্রষ্টা, নবী-রসুল, অবতার, আখেরাত ও ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হোলো না, অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা, সচ্চরিত্রবান হবার শিক্ষা এখানে একেবারেই রোইল না। এসলামের গৌরবময় ইতিহাস, সনাতন ধর্মীদের সত্যযুগের ইতহাস অর্থাৎ নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিবর্তে ইউরোপ-আমেরিকার রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনীই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোলো। ফলে এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটি মনে-প্রাণে প্রভুদের সম্বন্ধে একধরনের ভক্তি ও নিজেদের অতীত সম্বন্ধে হীনমন্যতায় ভুগতে লাগলো। বাস্তবতা এমন দাঁড়ালো যে তারা নিজেদের প্রপিতামহের নাম বলতে না পারলেও ইউরোপীয় শাসক, রাজা-রানী, কবি, সাহিত্যিকদের তস্য-তস্য পিতাদের নামও মুখস্ত করে ফেললো। নিজেদের সোনালী অতীত ভুলে যাওয়ায় তাদের অস্থিমজ্জায় এটা প্রবেশ কোরল যে সর্বদিক দিয়ে প্রভুরাই শ্রেষ্ঠ।

এই দুই অংশের বাইরে বাকি ছিলো উভয়প্রকার শিক্ষাবঞ্চিত এক বিশাল জনসংখ্যা; এই বৃহত্তর জনসংখ্যা শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রায় পশু পর্যায়ের বিশৃঙ্খল জনসংখ্যায় পরিণত হোয়েছে, যাদের না আছে ধর্মের জ্ঞান না আছে পার্থিব জ্ঞান। এরা পরকালিন মুক্তির আশায় মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত পরধনলোভী ধর্মব্যবসায়ীদের টাকা-পয়সা দিয়ে, দাওয়াত কোরে খাইয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। অন্যদিকে পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মহীন, চরিত্রহীন, কপট ও পাশ্চাত্য প্রভুদের গোলাম শ্রেণির শরণাপন্ন হয়। এরা উভয় শ্রেণির দ্বারা প্রতারিত, বঞ্চিত ও শোষিত হয়। যা হোক, এভাবে যখন প্রভুদের এদেশ ছেড়ে যাবার সময় হোলো

৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন

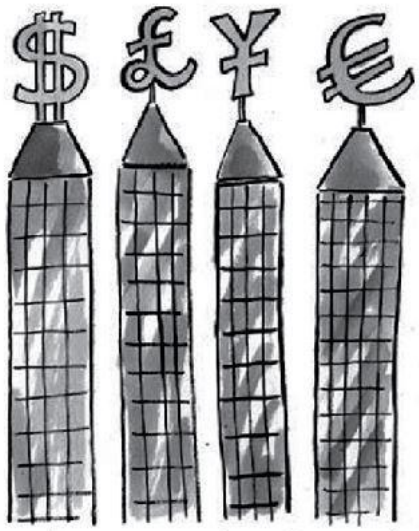

আজ ধর্ম থেকে মানবতা বিদায় নিয়েছে, ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মজীবীদের ব্যবসার পুঁজি। তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র উপাসনালয়গুলিতে তারা উড়িয়ে দিয়েছে স্বার্থের ঝাণ্ডা। টাকা ছাড়া ধর্মের চাকা নড়ে না।

ঈসা (আ:) দেখালেন- 'মানবতা আগে'

শেখ মনিরুল এসলাম

আমরা হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বান্তকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, বৈষম্য, হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি নির্মূল হতে পারে একমাত্র ঐক্যের সূত্র ধরে। এই সত্যটি আমরা যথাসাধ্য মানবজাতির সম্মুখে উপস্থাপন করছি। এখন প্রয়োজন শুধু নিজ নিজ ধর্মের শাশ্বত শিক্ষায় সকল ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। প্রশ্ন হচ্ছে- ধর্মের ঐ শাশ্বত শিক্ষা কী? এই শাশ্বত শিক্ষা হচ্ছে মানবতা। সকল ধর্মই মানবতার কথা বলে, মানবতার কল্যাণ সাধনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। প্রতিটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থে যে মানবতাবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা যদি আজকের মানবজাতি অনুধাবন করতে পারতো, সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হতো তাহলে সম্পূর্ণ পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে যেতো। আজ যেমন মানুষ অন্যায়-অবিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, অর্থাৎ মানুষ শান্তির চির আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবিক রূপ দেখতে পেতো। মানবতা হলো ধর্মের আত্মা। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা আর ধর্ম থেকে মানবতা পৃথক করা একই কাজ। পরিণতিও অভিন্ন, অর্থাৎ মৃত্যু। যে দেহে আত্মা নেই সে দেহের কোনো মূল্য থাকে না, অচিরেই তা পচে-গলে নষ্ট হয়ে যায়, এক সময় তার আর অস্তিত্ব থাকে না। একইভাবে আজকের পৃথীবিতে প্রচলিত ধর্মগুলো মানবতা থেকে বহু দূরে সরে যাওয়ায় ধর্মগুলো মানুষের কোনো উপকারে আসছে না, বরং ধর্মই মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ধর্মের ব্যর্থতা নয়, ধর্মকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে মানুষের ব্যর্থতা।

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় জাতি হলো খ্রিস্টান। পৃথিবীতে প্রায় দু'শ কোটির অধিক খ্রিস্টধর্মের অনুসারী রয়েছেন। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই যিশু খ্রিস্টের প্রদত্ত শিক্ষাকে অনুধাবন করে কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারতেন তাহলে পৃথিবীর অশান্তির কিছুটা হলেও প্রশমিত হতো। যিশু খ্রিস্ট কী শিক্ষা দিয়েছেন? আসুন বাইবেলে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে তা জানার চেষ্টা করি।

পথ দিয়ে যাবার সময় ঈসা (আ) একজন অন্ধ লোককে দেখতে পেলেন। অন্ধ ব্যক্তিটি জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। তাকে দেখে ঈসা (আ) মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করলেন। তারপর সেই কাদা তিনি অন্ধ লোকটির চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো। অন্ধ লোকটি তখন পুকুরে গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল। সে অভিভূত হয়ে গেল কারণ, সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল। তার দৃষ্টিশক্তি তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল, এ কি সেই লোক, যে কিছুক্ষণ পূর্বে ভিক্ষা করছিল? দৃষ্টি ফিরে পাওয়া ব্যক্তিটি বললেন, হ্যাঁ, আমি সেই লোক। ঈসা (আ) আমার দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।

বস্তুত দিনটি ছিল ইহুদিদের বিশ্রামবার। ইহুদি ধর্মের অন্যতম প্রধান বিধান হলো সপ্তাহে একদিন, শনিবার, জাগতিক কোনো কাজকর্ম না কোরে শুধু ধর্ম-কর্ম করা এবং সিনাগগে যেয়ে উপাসনা করা। এর নাম স্যাবাথ। ঈসা (আ) দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিশক্তি দান করে সেই স্যাবাথের নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। এতে ইহুদি ধর্মীয় নেতা ফরীসীরা প্রচণ্ড রেগে যায় এবং দৃষ্টি ফিরে পাওয়া ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বের করে দেয়। (new testament. john 9: 01-34)

স্যাবাথের আদেশ বাইবেলে (নিউ টেস্টামেন্টে) আছে এবং এটা যে রাব্বাই, ফারিসী অর্থাৎ পুরোহিতদের মনগড়া মতবাদ ছিল না তার প্রমাণ- এ কথা পবিত্র কোর'আনেও আছে (সুরা আন নহল- ১২৪)। এখন বাইবেলে (New Testament) পাচ্ছি যে, ঈসা (আ:) বছরের পর বছর ভিক্ষা কোরছে এমন একজন জন্মান্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন এবং দিলেন ঐ স্যাবাথের দিনে, শনিবারে। ঐ জন্মান্ধটি তো সারা জীবনই ঐ স্থানে বোসে ভিক্ষা কোরছিলেন। জন্মান্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়াই বা অলৌকিক শক্তি (মো'জেজা) দেখানই যদি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতো তবে ঈসা (আ:) শনিবার ছাড়া অন্য যে কোনদিন কি তা কোরতে পারতেন না? পারতেন, কিন্তু তিনি বেছে বেছে ঐ স্যাবাথের দিনটাতেই ঐ কাজ কোরলেন। এটা দ্বারা তিনি তাঁর জাতির জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

ঈসা (আ) কর্তৃক সেদিনের বিধান ভঙ্গের অন্যতম কারণ ছিল এটা বোঝানো যে, 'মানবিক কাজ বা মানবতার কল্যাণ সাধিত হয় এমন কাজ ঐ স্যাবাথের অর্থাৎ আইনের দোহাই দিয়ে বাদ দেয়ার অর্থ হলো ধর্মের আত্মাকে ধর্ম থেকে পৃথক কোরে রাখা। বস্তুত মানবতার জন্যই ধর্ম, কাজেই ধর্মের আইন-অনুশাসন কোনোভাবেই মানবতার কল্যাণের পথে বাধা হতে পারে না। যে ধর্ম মানবতার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেটা ধর্ম নয়, অধর্ম। সেটা পালন করে স্বর্গে আরোহন করা যায় না। এটাই ঈসা (আ:) এর শিক্ষা। ■

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র লেখা থেকে সম্পাদিত

উম্মতে মোহাম্মদীর সংগ্রাম কিসের লক্ষ্যে?

উদ্দেশ্য যদি ভুল হয় তাহলে কোন কিছুরই আর দাম থাকে না। ধরুন, ১০ জন লোক একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা হলো, অর্ধেক পথ গিয়ে যদি ১০ জনের উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কী হবে, একেকজন একেক কাজ কোরতে থাকবে, শেষ গন্তব্যস্থলে কেউই যেতে পারবে না। কাজেই এসলামে এই জন্য সকল পণ্ডিতগণ একমত যে আকীদা ভুল হোলে ঈমানের কোন দাম নেই। এই আকীদাই হলো (Comprehensive concept) সামগ্রিক ধারণা। পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন বা আকীদাহীন কোন কিছুই নেই। যা কিছু আকীদাহীন তাই অর্থহীন। সুতরাং কোন জাতি, গোষ্ঠী, দল বা আন্দোলনও উদ্দেশ্যহীন হোতে পারে না।

আজ যদি কোন কমিউনিস্টকে প্রশ্ন করা যায় যে, তোমরা পৃথিবীময় সংগ্রাম করছো, বহু কোরবানি কোরেছো, কমিউনিজমকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম কোরছ, এসব কেন কোরছ? ঐ কমিউনিস্ট অবশ্যই জবাব দেবেন যে, পৃথিবীতে যে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সেটার পরিণাম হোচ্ছে অর্থনৈতিক অবিচার, শোষণ, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। কাজেই সেটাকে ভেঙ্গে সেখানে কমিউনিজম চালু করলে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হবে, মানুষ খেয়ে পরে বাঁচবে এবং মানুষের ঐ কল্যাণের জন্য পৃথিবীময় কমিউনিস্টরা নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ কোরে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন- অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ কোরেছেন। কিন্তু তারা নিজেরাই যেখানে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত সেখানে অন্যদেরকে কিভাবে শান্তি দেবে!

ঠিক ঐ কারণেই অর্থাৎ মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বিশ্বনবীর (দ:) সৃষ্ট জাতি পার্থিব সব কিছু ত্যাগ কোরে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। শুধু তফাৎ এই যে, কমিউনিস্টরা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরতে সংগ্রাম কোরছে তা মানুষের তৈরি যা শান্তি, এসলাম আনতে পারবে না, আরও অশান্তি সৃষ্টি হবে। তার বাস্তব প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। কম্যুনিজমের পতন হোয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ হোতে চোলল।

আর বিশ্বনবীর (দ:) জাতি, উম্মাহ যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরতে সংগ্রাম কোরেছিলেন সে ব্যবস্থা হলো স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহর তৈরি ব্যবস্থা, দ্বিতীয় তফাৎ হলো মানুষের তৈরি বোলে কমিউনিজম মানুষের শুধু অর্থনৈতিক মুক্তির একটা ব্যবস্থা তৈরি কোরেছে। মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে ওটার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু মানুষ শুধু দেহ নয় আত্মাও, শুধু জড় নয় আধ্যাত্মিকও। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তা মানুষের দেহের ও আত্মার প্রয়োজনের নিখুঁত সংমিশ্রণ। আল্লাহ বলেন, 'এমনইভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী বা ভারসাম্যযুক্ত জাতি হিসাবে সৃষ্টি কোরেছি যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য আর যাতে রসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য (সুরা বাকারা ১৪৩)। এখানে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার কোরেছেন ওয়াসাতা যার অর্থ ভারসাম্যযুক্ত (Balanced), মধ্যপন্থী। এই ভারসাম্যযুক্ত জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজাতির মধ্যে শান্তি, এসলাম আনয়ন করাই হোচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য, যে জন্য আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীকে (দ:) পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যে কাজ এক জীবনে সমাপ্ত করা অসম্ভব, সে কাজের ভিত্তি তিনি স্থাপন কোরলেন সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে এই শেষ জীবনবিধানের অধীনে আনা। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ তাঁর জীবিত কালের সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্ট জাতিকে হাতে কলমে শিখিয়ে গেলেন এসলামের উদ্দেশ্য (সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজাতির মধ্যে এসলাম, শান্তি স্থাপন করা) ও প্রক্রিয়া (সালাত, সওম, হজ্ব , যাকাত ইত্যাদি)। এবং তাঁর সৃষ্ট জাতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি কোরিয়ে গেলেন যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব তাঁর (দ:) পরে তাদের উপর সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হবে। যারা এ দায়িত্ব পালন কোরবে না তারা আর তাঁর জাতিভুক্ত থাকবে না।

আজকে সারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে উম্মতে মোহাম্মদী বোলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কিন্তু তারা জানেন না উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে কি তাদের দায়িত্ব। তাদের বিশ্বাস নামাজ রোজা করাই তাদের একমাত্র কাজ। আরও ভালো উম্মতে মোহাম্মদী হোতে নামাজ রোজা ইত্যাদি উপাসনাগুলিই আরও বেশি বেশি কোরতে হবে এবং তা করেই যাচ্ছে। তারা ভুলেই গেছেন তাদের সৃষ্টিই হোয়েছে আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে। তা না কোরে এই জাতি ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের দেওয়া বিভিন্ন মতবাদ, জীবনব্যবস্থা যেমন গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, এক নায়কতন্ত্র ইত্যাদি মেনে নিয়ে আর নামাজ, রোজা কোরে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তারা জানেনও না যে তারা আর রসুলের জাতিভুক্ত নেই, মো'মেন-মোসলেমও নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা কেবল কাফের-মোশরেক এবং অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন।

নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, এই জাতির সংগ্রাম ত্যাগকারী মহা মোসলেমদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী, যিনি মানবজাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সুন্নাহ হোয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর বিপ্লব নয়- তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহ্বায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মত ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। মানব ইতিহাসে কোন জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন কোরেছে বোলে আমাদের জানা নেই।

এরা যদি আজও সেই পৃথিবী কাঁপানো ব্যক্তিত্বকে তাদের নিজেদের মতো গর্তের ভেতরে লুকানো মেরুদণ্ডহীন খরগোশ মনে কোরে তার অপমান কোরতে থাকেন তবে এরপর আল্লাহর শাস্তি হবে আরো কঠিন, তার প্রতিশোধ হবে আরও ভয়াবহ। ■

(বাম থেকে) সিলেট মহানগর ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন পাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শরদিন্দু ভট্টাচার্য, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ (অব) ননী গোপাল দাশ, সিলেট বৌদ্ধ বিহার এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের, দৈনিক দেশেরপত্রের সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক রিয়াদুল হাসান, মদন মোহন কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি ও ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অরুন দেব নাথ সাগর, পিছনের সারিতে রতিন্দ্র দাশ ভক্ত, বিদ্যা ভুষণ চন্দ, অলক বরণ দাশ, সৌরভ দেব প্রমুখ।

৩০ আগস্ট সিলেট বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন বীরেষচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এক সর্বধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শরদিন্দু ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষা এক, পার্থক্য শুধু উপাসনার পদ্ধতিতে। তাতে সমস্যাটা কি? আমার কাছে যেটা ভালো লাগবে আমি সেটাই করবো। মুসলিম শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে যিনি স্রষ্টার সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন। মুসলিম মানে করিম, রহিম, আবদুল্লাহ এরকম নাম হতে হবে তা নয়। যিনি স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন তিনিই মুসলিম। সেই হিসাবে আমিও তো মুসলিম। আবার সনাতন শব্দের অর্থ যদি হয় চিরন্তন, শাশ্বত, আদি, তাহলে সেই অর্থে আমি সনাতন ধর্মেরও অনুসারী। তবে কেন জানি আমরা ঐ মিলগুলি আলোচনা না করে শুধু অমিলগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই। অথচ একটা বিন্দুও যদি পাওয়া যায় ঐক্যের জন্য সেই বিন্দু দিয়ে বড় রকমের একটা ঐক্যে আমরা পৌঁছতে পারি। আর এখানেতো বিন্দু নয় আপনারা অনেক বড় বড় বাক্য, অনেক বড় বড় প্যারা উপস্থিত করেছেন। কাজেই কেন আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো না?'

সিলেট বৌদ্ধ বিহার এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘানন্দ থের তার বক্তব্যে বলেন- 'মনুষ্যত্বই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। আমি মনে করি মনুষ্যত্বই সনাতন ধর্ম। দার্শনিকরা বলেন, মানুষ হচ্ছে যার পাপ ও পূণ্যের মানদণ্ড সম্পর্কে হুশ আছে। মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন সে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কিছুই থাকে না। সে থাকে কেবলই মানুষ। তারপর সে যে পারিপার্শ্বিকতায় বড় হয় সেই ধর্মই সে ধারণ করে। কিন্তু সে যদি প্রথম ধর্ম মনুষ্যত্বকেই ধারণ না করতে পারে তবে সে কখনোই একজন মুসলিম-সনাতন বা বৌদ্ধ হতে পারবে না। শত্রুতা দিয়ে শত্রুতা দমন করা যায় না, একমাত্র মৈত্রী ও ভালোবাসা দিয়েই শত্রুকে জয় করা যায়। আমরাও তাই ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাইদেরকে যদি ভালোবাসতে পারি, কেউ আমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারবে না।'

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ননী গোপাল দাশ বলেন, 'সকল ধর্মের মর্ম কথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা এ কথাটি ধর্মের আত্মা। সকল ধর্মই একই গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছে। আমরা যতো দিকে যাই না কেন একই স্রষ্টার কাছে যাবো। সুতরাং পথের মাঝখানে শত্রুতা পোষণ নিতান্তই মূর্খতা।' ■

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) গোপালগঞ্জ; মসীহ উর রহমা প্রহ্লাদ চন্দ্র বিশ্বাস, সভাপতি, গোপালগঞ্জ; শাহানা পন্নী (রু অনুকূল বিশ্বাস, সহ-সভাপতি,

এমএম আনিসুর রহমান, গো
গত ২৭ আগস্ট গোপালগঞ্জ মর্মকথা, সবার উর্ধ্বে মানব গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে আমাদের প্রচেষ্টা

সমস্ত মানবজাতি একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সকল ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, অবতার ও নবী-রসুলগণ একই স্রষ্টার নিকট থেকে আগত। সকল নবী-রসুল, অবতারই এসেছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তির দিশারী হয়ে। অপরিসীম শ্রম, সাধনা আর ত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা স্রষ্টার কাছ থেকে আনীত শিক্ষাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের আনীত এই আদর্শ সমাজকে করেছে শান্তিময়, মানবজাতিকে করেছে সুখী, সমৃদ্ধ। কিন্তু পৃথিবী থেকে তাদের প্রস্থানের পর প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের মধ্য থেকে ওঠে এসেছে একটি ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি যারা ধর্মকে তাদের রুটি-রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটির হাতে পড়ে মহামানবদের আনীত সেই জীবনব্যবস্থা বিকৃত হতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে সেই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মানবতার কল্যাণে আগত ধর্মই এক সময় মানবতাগ্রাসী হয়ে ওঠে। এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ এক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের শত্রুজ্ঞান করে। একই স্রষ্টার প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও এক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের অবতার, নবী, রসুল ও মহামানবদের অস্বীকার করে, এমনকি গালাগালি করে। আরেকটি শ্রেণি ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতিতে। এভাবে ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিকারীদের হাতে পড়ে মানবজাতি আজ বিভক্ত, পরস্পর ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত। দৈনিক দেশেরপত্র, দৈনিক বজ্রশক্তি ও দৈনিক নিউজ মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে দেশব্যাপী। ■

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) সরজকান্তি বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, রঘুনাথপুর; বাদল কৃষ্ণ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, গোপালগঞ্জ; মসীহ উর রহমান, উপদেষ্টা, দৈনিক দেশেরপত্র; প্রফেসর অশোক কুমার সরকার, অধ্যক্ষ শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ; ডা: প্রহ্লাদ চন্দ্র বিশ্বাস, সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, গোপালগঞ্জ; বিশিষ্ট শিল্পপতি বিজয় কুমার মোদী; মো: খলিলুর রহমান, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ; শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ), ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র; অ্যাড. জগদীশ চন্দ্র বৈদ্য, সভাপতি, সার্বজনীন কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী; পাষ্টর অনুকূল বিশ্বাস, সহ-সভাপতি, খ্রিস্টান ফেলোশীপ, গোপালগঞ্জ ও রেভা: সামুয়েল এস বালা, সভাপতি, খ্রিস্টান ফেলোশীপ, গোপালগঞ্জ

এমএম আনিসুর রহমান, গোপালগঞ্জ:

গত ২৭ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে "সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা' শীর্ষক এই সেমিনারে অতিথির বক্তব্যে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো: খলিলুর রহমান বলেন- 'আজকের এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে এ ধরনের বহু উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে সেগুলোর অধিকাংশই সফলতার মুখ দেখে নি। কিন্তু এবার সফল করতে হবে। এ দেশে আমরা সকল মানুষ একই খাবার খাই, একই আবহাওয়ায়

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত (বাম থেকে) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বগুড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী নিরঞ্জন সিংহ, দৈনিক দেশেরপত্রের বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান মনিরুয্যামান মনির, সম্পাদক শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ), অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আশরাফুজ্জামান, জেলা পরিষদ প্রশাসক ডাঃ মোঃ মকবুল হোসেন, বগুড়া জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ডাঃ এন সি বাড়ই ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রী কল্যাণ প্রসাদ পোদ্দার ।

আব্দুর রহিম, জেলা প্রতিনিধি, বগুড়াঃ

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জনপদ, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের স্মৃতি বহনকারী বগুড়ার জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত সর্বধর্মীয় সম্মেলনে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আশরাফুজ্জামান বলেন, "একটা কথা সবাই আমরা একবাক্যে স্বীকার করব, এমন কোন ধর্ম নেই যেখানে বলা আছে অন্যদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হোক। সব ধর্মেই মানবতার কথা, মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করার কথা বলা আছে। আমরা যদি মানুষের অতীতের দিকে তাকাই, আমরা দেখবো যখনই আমরা দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি তখনই সফলতা এসেছে। ৫২-৬৯-৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি, তখনই আমরা বিজয় লাভ করেছি।" বিশেষ অতিথি শ্রী নিরঞ্জন সিংহ বলেন, 'আজ হিন্দুরা বলতে পারবে না, মুসলিমরাও বলতে পারবে না যে আমরা শান্তিতে আছি। এর কারণ আমরা সবাই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে সরে গেছি। সকল ধর্মের লোকেরাই আজ ধর্মব্যবসায়ীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে।'

দেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, া সরকারি মহিলা কলেজ; ডাঃ লিলুর রহমান, জেলা প্রশাসক, ীন কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী; পাইকর গোপালগঞ্জ

ডাঃ এন.সি. বাড়ই বলেন, 'এটি একটি অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠান। এর বৈপরীত্য ও মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের জগতে হেযবুত তওহীদ যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নিয়েছে সেই সমন্বয়বাদ অচিরেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।'

শ্রী কল্যাণ প্রসাদ পোদ্দার বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'আজকে আমার কাছে খুব আনন্দ লাগছে যে এ ধরণের একটি মহৎ উদ্যোগ নিয়ে এমামুয্যামানের অনুসারীরা কাজ করছেন। আমি দেখেছি ধর্মের নামে যে অপব্যাখ্যা সমাজে প্রচলিত আছে, কেউ সেগুলির প্রতিবাদ করে না। ফলে ধর্মের নামে অধর্ম প্রসার লাভ করে। আজকে দেশেরপত্রের কাছে প্রতিবাদের ভাষা আমরা খুঁজে পেয়েছি।

জেলা পরিষদের প্রশাসক মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, 'স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে সে আশাও আমরা কখনো করি নি। আমরা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান সবাই মিলে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম। অত্যন্ত খুশির বিষয় সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার সম্ভাবনা আজ আবার দেখতে পাচ্ছি।' দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী বলেন, 'আমার বাবা মাননীয় এমামুয্যামান জীবনে কখনো নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেন নি। তিনি তাঁর সমস্ত অর্জন, সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন মানুষের কল্যাণে, আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে। আমরাও তাঁর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের জীবন, সম্পদ সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করে কাজ করতে নেমেছি। এই বিরাট কাজে আপনাদের সবার সহযোগিতা চাইতেই আপনাদের কাছে আসা।' ■

২ ধরনের বহু উদ্যোগ নেয়া কাংশই সফলতার মুখ দেখে শে আমরা সকল মানুষ একই
২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক দেশেরপত্র ও দৈনিক বজ্রশক্তির উদ্যোগে আয়োজিত সর্বধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) দৈনিক দেশেরপত্রের খুলনা বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান মাকসুদে মাওলা, দৈনিক দেশেরপত্রের উপদেষ্টা মসীহ উর রহমান, পিরোজপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, দৈনিক গ্রামের সমাজ এর নির্বাহী সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান (বিপ্লব), নাজিরপুর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এর সভাপতি সুনীল রঞ্জন হালদার, পিরোজপুর জেলা জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী চন্দ্র শেখর হালদার, বৈদিক সমাজ বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জীব কুমার রায়, দৈনিক দেশেরপত্রের বরিশাল বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান রুহুল আমিন

রণদীপ কুমার মিস্ত্রীঃ

গত ২৬ আগস্ট পিরোজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সর্বধর্মীয় সম্মেলনে বিশেষ অতিথিদের বক্তব্যে চন্দ্র শেখর হালদার বলেন, ধর্মের নামে যাতে কেউ অপব্যাখ্যা দিতে না পারে তার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা দেশেরপত্র ও বজ্রশক্তির উত্থাপিত বিষয়ের প্রতি একমত। হাসান আম্মান লিটন বলেন, দেশেরপত্র ও বজ্রশক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাই আমরা তাদের সাথে আছি ও থাকব। যে কোন প্রয়োজনে আমরা সাহায্য করব। ধর্মব্যবসায়ীরা যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশেরপত্রের উপদেষ্টা মসীহ উর রহমান তার বক্তব্যে বলেন-ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণের জন্য। ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়। মাকসুদে মাওলা তার বক্তব্যে বলেন- আমরা যামানার এমামের অনুসারী হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সদস্য। আমরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মাঠে আছি। প্রধান অতিথি আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান বলেন, ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের নবী কোন হিংসাত্মক কাজের শিক্ষা দেন নাই। নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ধর্ম ব্যবহার করে ধর্মে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা নিষেধ। সবাইকে বিবেক দিয়ে কাজ করা উচিৎ। হানাহানি বাদ দিয়ে শান্তির পথে চলার শিক্ষা প্রত্যেক ধর্মেই নিহিত রয়েছে। ■

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) দৈনিক দেশেরপত্রের চট্টগ্রাম বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান মো: মাঈন উদ্দীন, লক্ষীপুর শিল্পকলা একাডেমির সদস্য সচিব মো: জাকির হোসেন ভুঁঞা আজাদ, হিউম্যান রাইটস এন্ড রিভিউ সোসাইটির অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান মিস্টার, দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ্), লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোরশেদ আহম্মেদ, রায়পুর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিশ্বেশ্বর পাল, লক্ষীপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন পাঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, লক্ষীপুরঃ

গত ২৫ আগস্ট লক্ষীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত সর্বধর্মীয় সম্মেলনে লক্ষীপুর জেলার শিল্পকলা একাডেমির সদস্য সচিব জাকির হোসেন ভুঁঞা আজাদ বলেন, আমি আয়োজকদের নামে নানা ধরনের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, দেশেরপত্রের আলোচনা সভাগুলোতে ইসলাম ধর্মকে আঘাত করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে এসে দেখতে পেলাম, দেশেরপত্র যা উপস্থাপন করছে তা অকাট্য সত্য। ধর্মব্যবসা, ধর্মের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বা অপরাজনীতির ব্যাপারে তারা যা বলছেন তা কোন ধর্মকে আঘাত করে না। বরং তারা ধর্মের প্রকৃত রূপই মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন। আমি বুঝতে পারছি, তাদের নামে এতদিন যা শুনেছি সবই মিথ্যা ও অপপ্রচার ছিল।' শ্রী বিশ্বেশ্বর পাল বলেন, আমি মনে করি আজকের এই অনুষ্ঠানে সবারই উপস্থিত থাকা উচিৎ ছিলো। বিশেষ করে যারা সত্যকে অনুসন্ধান করে বেড়ান তাদের। দেশেরপত্র আজ যে সত্য উপস্থাপন করেছে, তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। তাদের এই আদর্শকে যদি প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া সম্ভব হতো, তাহলে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে তা রোধ করা সম্ভব হতো। যারা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করে, রাজনীতি করে, সন্ত্রাসবাদ করে তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহানা পন্নী। তিনি বলেন, আজ এক ধর্মের অনুসারীরা আরেক ধর্মের অনুসারীদের শত্রু বলে গণ্য করি, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করি। নিজেদের মধ্যকার এই বিদ্বেষ, এই ঘৃণা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।' তিনি বলেন, 'ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। কিন্তু কতিপয় ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিকারী মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে, ধর্মের প্রতি মানুষের দুর্বলতাকে তাদের মধ্যে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। ■

বাম থেকে শফিকুল আলম উখবাহ, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র; শ্রী দিপক কুমার পাল, সাধারণ সম্পাদক, জেলা কৃষকলীগ, গাইবান্ধা ও জেলা সেক্টর কমান্ডার ফোরাম এবং সম্পাদক, দৈনিক জন সংকেত; অধ্যক্ষ পরেশ চন্দ্র সরকার, সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গাইবান্ধা জেলা শাখা; শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ), ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র; অ্যাডভোকেট সৈয়দ এস আলম হিরু, জেলা পরিষদ প্রশাসক এবং সভাপতি, গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগ; আব্দুর রাজ্জাক, সহকারী কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, গাইবান্ধা এবং আরিফুল এসলাম, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক দেশেরপত্র।

গাইবান্ধা প্রতিনিধিঃ

গত ২০ আগস্ট গাইবান্ধা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সর্বধর্মীয় সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ এস আলম হিরু পবিত্র কোর'আনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন, 'যার যার ধর্ম তার তার কাছে'। এটাই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু যারা ধর্মের নামে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। তিনি এ ধরনের গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। শ্রী দীপক কুমার পাল বলেন, দেশেরপত্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দেশব্যাপী যে সেমিনারগুলোর আয়োজন করে যাচ্ছে সেগুলোকে চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশের সকল স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তরুণ সমাজের মাঝে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এ আহ্বানকে পৌছে দিতে পারলে বিজয় সুনিশ্চিত। অধ্যক্ষ পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, বিভিন্ন ধর্মে তাঁর একাধিক নাম রয়েছে। সবাইকে মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। তাই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তিনি কতিপয় নীতিভ্রষ্ট রাজনীতিবিদদেরকে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করার মানসিকতা ত্যাগ করার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের উদ্দেশ্যে দেশেরপত্রকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্যে বলেন- দেশেরপত্রের আজকের এই অনুষ্ঠানটি সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার এ উদ্যোগ সত্যই অভূতপূর্ব। আমি কোনো অনুষ্ঠানে ২০ মিনিটের বেশি সময় উপস্থিত থাকি না। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে কীভাবে ৪ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।

অনুষ্ঠানে দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহানা পন্নী বলেন- 'আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে চিরন্তন ও সনাতন সত্যের পক্ষে। সকল ন্যায় ও শান্তির উৎস হলেন মহান স্রষ্টা। তাঁর বিধানের আনুগত্য না করে কোনো পথেই শান্তি আসবে না। তাই সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি আমাদেরকে একটাই আহ্বান- আসুন, কোন কোন বিষয়ে আমাদের সকল ধর্মে মিল আছে সেগুলো খুঁজে বের করি, অমিলগুলোকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখি, বিচ্ছেদের রাস্তা না খুঁজে সংযোগের রাস্তা খুঁজি। ■

গত ৪ আগস্ট বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আয়োজিত সর্বধর্মীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন (ডান থেকে) ক্যাথরিন রোজারিয়া আর এন ডি এম, দেশেরপত্রের খুলনা বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান ডাঃ মাকসুদে মাওলা, বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের চিকিৎসক জ্ঞান রঞ্জন চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য ও বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বাগেরহাটের সভাপতি শিবু প্রসাদ ঘোষ, বাগেরহাট জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাডঃ মিলন কুমার ব্যানার্জী, মহিলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিল্পি রানী সমাদ্দার, দেশেরপত্রের সাব-এডিটর সাইফুর রহমান।

মঞ্চে উপস্থিত (বাম থেকে) রেভাঃ খোকন দাস, সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ঝিনাইদহ; কনক কান্তি দাস, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, ঝিনাইদহ সদর ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ; অ্যাড. জে. মৌ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আমরা কিছু করি সমাজ সেবা সংগঠন; শেখ মনিরুল এসলাম, সাব-এডিটর, দৈনিক দেশেরপত্র; অ্যাড. আব্দুল ওয়াহেদ জোয়ার্দার, জেলা পরিষদ প্রশাসক, ঝিনাইদহ ও সহ-সভাপতি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ; অ্যাড. আব্দুর রশীদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ; শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ), ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র; নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, সভাপতি, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ঝিনাইদহ জেলা; অ্যাড. সুবীর কুমার সম্মাদার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ঝিনাইদহ জেলা শাখা ও প্রেসিডিয়াম সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জেলা জিপি, ঝিনাইদহ; প্রফুল্ল কুমার সরকার, সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা; এম.ডি. লোটন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আনন্দ মেলা সংগঠন, ঝিনাইদহ।

মোঃ শাহীন আলম, ঝিনাইদহঃ

গত ৩০ আগস্ট ঝিনাইদহ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে 'সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা'। অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিবৃন্দকে দৈনিক দেশেরপত্রের আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)। তিনি তার বক্তব্যে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মব্যবসা নিরসন করে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মহামান্য এমামুয্‌যামানের প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আব্দুল ওয়াহেদ জোয়ার্দার বলেন- অহিংসা পরম ধর্ম। কোনো ধর্মই হিংসার-বিদ্বেষ ও বিভেদের শিক্ষা দেয় না। কিন্তু আমরা ধর্মের অজুহাতে অহরহই হিংসার জন্ম দিচ্ছি। আজ আমাদের সম্মুখে সাম্প্রদায়িকতা এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি দ্রুত এর সমাধান অনিবার্য।"

বিশেষ অতিথি নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস বলেন- ইসলাম ধর্মে আছে লা ইলাহা ইল্লাহ আর হিন্দু ধর্মে আছে একম ব্রহ্মা দ্বৈত্য নাস্তি। আমাদেরকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলে সেই এক স্রষ্টার বিধানের আশ্রয় নিতে হবে। তবেই আমরা মুক্তি পাবো। আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের একমাত্র শান্তির পথ- ঐক্য।

অ্যাড. সুবীর কুমার সম্মাদার বলেন- "প্রতিটি জাতির মধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রসুল, অবতার এসেছেন। এই মহামানবদের শিক্ষা কার্যকরি করে মানুষ শান্তিপূর্ণ সমাজ পেয়েছে। তিরি আরো বলেন, ধর্মব্যবসায়ীরা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নামক যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছে তার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।"

বিশেষ অতিথি কনক কান্তি দাস বলেন- স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। কিন্তু হিন্দুধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সে শিক্ষার প্রতিফলন কোথায়? তারা কার্যত বেদের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। আবার রসুলাল্লাহ তাঁর শেষ ভাষণে জাতির উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো কি আজকের মুসলিমরা মেনে চলছেন? চলছেন না। বৌদ্ধরা ত্রিপিটকের কথা মানছেন না। এভাবে কোনোদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা মেনে চলতে হবে।'

এরপর অ্যাড. জে. মৌ চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তব্য দানকালে বলেন- "আমরা যদি বজ্রশক্তি ও দেশেরপত্রের এই উদ্যোগে একাত্মতা প্রকাশ না করি তাহলে অকৃতজ্ঞ থেকে যাবো। কাজী নজরুল লিখেছেন- 'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান'। এই মানবতার মুক্তির জন্যই বজ্রশক্তি ও দেশেরপত্র কাজ করে যাচ্ছে। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।" ■

---

২৫ পৃষ্ঠার পরঃ বসবাস করি, কিন্তু বিভক্ত হই ধর্মের ভিত্তিতে। কেউ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে অপরের সহযোগিতা পায়। এটাই জগতের নিয়ম। এটাই হলো মানবতার কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা। কিন্তু আমরা সেই নিয়ম-নীতি আর মানবতাকে উপেক্ষা করে চলেছি। আজকের সমাজে সহযোগিতা-সহমর্মিতার কথা আলোচিত না হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।'

ডাঃ প্রহ্লাদ চন্দ্র বিশ্বাস বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন- 'আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি ধন্য। আমরা যদি মানবতাকে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, অন্যায়-অবিচার থাকবে না। ধর্ম কাকে বলে? ধর্ম হলো যাকে ধারণ করা হয়। আমাদেরকে মানবতা ধারণ করতে হবে। মানবতার কল্যাণই হলো সকল শাশ্বত, সনাতন ধর্মের মূলকথা। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এই যদি হয় ধর্মের কথা, তাহলে আমাদের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত কেন? আমাদের উচিৎ মানবতাকে ধারণ করা।'

বিশিষ্ট শিল্পপতি বিজয় কুমার মোদী তার বক্তব্যে বলেন- মানুষ হলো স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একটি গাভী যখন দুধ দেয় তখন কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান তা দেখে না। কারও ব্যাপারে সে বৈষম্য করে না। তাহলে আমরা মানুষ হয়ে কেন আমাদের নিজেদের মধ্যে এই বিভেদের প্রাচীর খাড়া করে রেখেছি? ঈশ্বর মানুষের কল্যাণের জন্য যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানকে কল্যাণের পথে খরচ না করে আমরা একে অপরকে হত্যা করে চলেছি। মানুষের জন্য ধর্ম। মানুষের শান্তির জন্য ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্মকে উছিলা করেই যখন একজন মানুষ আরেকজনকে হত্যা করে, তখন ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা কোথায় থাকে?' তিনি বলেন- দৈনিক দেশেরপত্র পত্রিকা তাদের আদর্শকে ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এই আমার চাওয়া'।

অ্যাড. জগদীশ চন্দ্র বৈদ্য তার বিশেষ অতিথির বক্তব্য দানকালে বলেন- 'আমরা সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে বারবার যখন জর্জরিত হয়ে চলেছি তখন এ ধরনের সময়োপযোগী পদক্ষেপের বড়ই প্রয়োজন ছিল। আমরা কেমন যেন ভুলে যাই যে, আমরা মানুষ। আজকে ধর্মে ধর্মে যে কোন্দল সারা দুনিয়ায় চলছে তার নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে। আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ হওয়া।'

অধ্যক্ষ প্রফেসর অশোক কুমার সরকার বলেন-

'হিংসা-বিদ্বেষ যতক্ষণ আমাদের সহাবস্থান করবে ততক্ষণ আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না। আমরা কাঙ্ক্ষিত শান্তি পাবো না। আমাদেরকে আগে অনৈক্যের কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

দৈনিক দেশেরপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহানা পন্নী বলেন- আজকে সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিরাজিত এত অন্যায়-অবিচার, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদির মূল কারণ হলো সকল ধর্মের অনুসারীরাই তাদের যার যার ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরাই মানবতা থেকে দূরে সরে গেছে, অথচ মানবতার কল্যাণ সাধনই প্রতিটি ধর্মের মর্মকথা। আমরা এই মানবতার স্বরূপ প্রকাশ করার জন্যই চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিকারীরা আমাদের এই মহৎ উদ্যোগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টায় লিপ্ত। এনশা'আল্লাহ আমরা সফল হবো। একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই পিতা-মাতার সন্তান মানবজাতি অচিরেই ঐক্যবদ্ধ হবে। ■

প্রকৃত ধার্মিক কারা

আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্রষ্টার দেওয়া সত্যদীন, দীনুল কাইয়েমা তথা সনাতন, শাশ্বত জীবনব্যবস্থার দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্যের প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা ঐকমত্য পোষণ করছেন। এই সত্য প্রচার কোরে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অনেকেই তাদের জীবনকে উৎসর্গ কোরে যাচ্ছেন। কিন্তু এই কাজ কোরতে গিয়ে এমনও অনেককে পেয়েছি যারা সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজিত অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, দুঃখ, দারিদ্র্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত ইত্যাদি দেখেও নির্বিকারভাবে খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, চাকরি করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, ধর্ম পালন করছে, দৈনন্দিন কাজ করছে আর আনন্দচিত্তে বলছে আমরা তো ভালোই আছি, আমরা তো সুখেই আছি, আমাদের তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কেন শুধু শুধু ঝামেলার মধ্যে জড়াবো?

এরা যখন দামি গাড়ি-বাড়ি ব্যবহার করেন, দামি হোটেলের দামি খাবার খান, মহামূল্যবান পোষাক পরেন তখন একটি বারও সমাজের বুভুক্ষু, হাড্ডিসার, আর্তপীড়িত মানুষের করুণ চিত্র তাদের চোখে ভাসে না, অন্তরে রেখাপাত করে না, সমবেদনা জাগ্রত হয় না। এদের শরীর অর্থ-সম্পদের দাস, আর আত্মা মৃতপ্রায়। এদের সম্পর্কেই স্রষ্টা বলেছেন- তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট! আবার এক শ্রেণি রোয়েছে যাদের মন-মগজ মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-প্যাগোডার চার-দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধ। এরা সারাদিন রোজা রাখেন, গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন, পূজার বেদিতে প্রসাদ অর্পণ করেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, রোজ রোজ জীবে প্রেম করার শপথ বাক্য পাঠ করেন, জপমালা জপেন, শ্রদ্ধার সাথে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু ঐ মসজিদ, ঐ মন্দির, ঐ প্যাগোডা বা ঐ গীর্জার পাশেই যে বুভুক্ষু হাড্ডিসার দুর্বল মানুষটি দু'দিন হলো না খেয়ে পড়ে আছে তার দিকে ভুলেও চেয়ে দেখেন না। সমাজের অত্যাচারিত, মজলুম, আর্তপীড়িত মানুষের ক্রন্দনের দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না কারণ ওটা তাদের কাছে দুনিয়াদারী। তারা এই দুনিয়াদারী না কোরে সদা ধর্মপালনে রত থাকেন! এরাও প্রকারান্তরে ঐ শ্রেণির মধ্যেই পড়ে যাদেরকে স্রষ্টা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছেন। দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, পায়জামা, রোজারি, গেরুয়া বসন এসব ধর্মীয় বেশ ভুষা ধারণ কোরেই ধার্মিক হওয়া যায় না। ধার্মিক হতে হলে ধর্ম তথা মানবতাকে ধারণ করতে হয়। কাজের মাধ্যমে মানবতার প্রতিফলন ঘটাতে হয়। মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জন দিতে হয়। তবেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভব।

প্রকৃত ধার্মিক হতে হলে আগে জানতে হবে প্রকৃত ধর্ম আসলে কী? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ প্রণীত সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানে ধর্ম শব্দের অর্থ করা হয়েছে- 'স্বভাব, শক্তি, গুণ' অর্থাৎ বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সেই নীতি যা সে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। প্রতিটি পদার্থ, প্রতিটি প্রাণীরই সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিগত কিছু গুনাগুণ থাকে যাকে উক্ত পদার্থ বা প্রাণীর ধর্ম বলে। যেমন আগুনের ধর্ম পোড়ানো, উত্তাপ দেওয়া, আলো দেওয়া। আগুনের এই গুণ সনাতন, শাশ্বত। লক্ষ বছর আগেও আগুন পোড়াতো, লক্ষ বছর পরও পোড়াবে। এটাই তার ধর্ম। এখন যদি আগুন কোন কারণে পোড়াতে ব্যর্থ হয়, উত্তাপ না দেয়, আলো নির্গত না করে তবে ঐ আগুনকে কি আগুন বলা যাবে? সে তো শুধু আগুনের প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ শুধুমাত্র আগুনের অবয়ব ধারণ কোরে আছে। একইভাবে হীরক যদি তার কাঠিন্য, ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য হারায় তবে তাকে আপনি কী বলবেন? বাঘ যদি তার হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা, গতিশীলতা, শক্তি, সাহস হারায় তবে সে বড় দেহধারী বিড়াল ছাড়া আর কী? একইভাবে মানুষেরও কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, ধর্ম রোয়েছে; এই ধর্মগুলির কারণেই সে মানুষ, তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাহলে মানুষের সেই ধর্মগুলি কী? মানুষের ধর্ম হলো মানুষের অভ্যন্তরস্থ মানবীয় গুণাবলী। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি, দয়া, মায়া, ভালোবাসা, মনুষ্যত্ব, মানবতা, সৌহার্দ্যতা, বিবেক, সহমর্মিতা, ঐক্য, শৃঙ্খলা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলী হলো মানুষের ধর্ম। যতক্ষণ একজন মানুষ অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয়, অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়, অন্যের আনন্দে আনন্দিত হয়, অপরকে সহযোগিতা করে, আর্তপীড়িতের পাশে দাঁড়ায় ততক্ষণ সে ব্যক্তি ধার্মিক হিসেবেই পরিগণিত হবার যোগ্য। এতে সে স্রষ্টার পূজা-উপাসনা-অর্চনা, নামাজ, রোজা, স্রষ্টার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করুক আর না করুক। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন হারিয়ে যায় তখন তার কোনো ধর্ম থাকে না। সে তখন ধর্মহীন হয়ে যায়। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না, পশুতে পরিণত হয়। এটাই আল্লাহ কোর'আনে বোলেছেন- তারা চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট (সুরা আ'রাফ-১৭৯)।

কাজেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, যে কোন ধর্মের মানুষ এমনকি ধর্ম অস্বীকারকারী তথা নাস্তিক ব্যক্তিও যদি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হয় তবে তার সমপরিমাণ দুঃখ সকলের অনুভব করা উচিৎ। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা মোসলেম যে ধর্মেরই অনুসারী হোক বর্তমান পৃথিবীর নির্যাতিত ফিলিস্তিনি শিশুদের রক্তস্রোত যদি কারোর চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত না করে, আফ্রিকার হাড্ডি-কঙ্কালসার মানুষগুলোর ক্ষুধা, দুঃখ, দারিদ্র্য যদি কারোর বিবেককে আন্দোলিত না করে, ভারতের ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদ যদি কারোর কর্ণকুহরে না পৌছে, পৃথিবীব্যাপী মানুষে মানুষে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, হানাহানি চললেও যদি কেউ ভালোই থাকে তবে এটা বলতে দ্বিধা নেই যে সে তার মানবীয় ধর্ম হারিয়েছে। সুতরাং সে আর মানুষ নেই, পশুতে পরিণত হয়েছে। আর এমন মানুষ দিয়ে যখন সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন সেই সমাজকে আর মনুষ্যসমাজ না বোলে শ্বাপদসংকুল অরণ্য বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। এই পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাস করার কোনো অধিকার এই মানুষ নামের জন্তু জানোয়ারদের নেই। যদি সে স্রষ্টার উপাসনা-এবাদত, পূজা অর্চনা করে আকাশ-পাতাল পরিপূর্ণও করে ফেলে তথাপি সে ধার্মিক হতে পারবে না। দাহ্যশক্তিহীন আগুন যেমন ধর্মহীন, মূল্যহীন, তেমনি মনুষ্যত্বহীন বিবেকহীন, মানবতাহীন মানুষও ধর্মহীন, মূল্যহীন।

আজকে আমরা ধার্মিক বলতে মানবতা বা মনুষ্যত্ব ধারণকারী বুঝি না, বুঝি ঐ দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি তথা ধর্মীয়

বেশ-ভূষা ধারণকারীদেরকে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, আমি মানুষের পোশাক দেখি না, দেখি অন্তর ও তার কাজ (হাদিসে কুদ্‌সী)। আল্লাহ মানুষকে এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কী এই এবাদত? এবাদত মানে কি নামাজ-রোজা, পূজা-পার্বণ, প্রার্থনা, উপবাস? মোটেও নয়। মানুষের নামাজ রোজা, পূজা অর্চনা স্রষ্টার কোনো কাজে আসে না। তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি আমাদের উপাসনার কাঙাল নন। তাই তিনি এই উপাসনা করার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেন নি। তিনি যে এবাদতের কথা বলেছেন তার অর্থ হলো স্রষ্টার দেওয়া বিধান মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করে অন্যায়-অবিচার, অশান্তিমুক্ত জীবনযাপন করা। মানুষ শান্তিতে থাকলেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি। আর মানুষের অশান্তিতে স্রষ্টার অসন্তুষ্টি। তাই তিনি যুগে যুগে অবতার-নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে শান্তির পথনির্দেশ করেছেন। সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর কোরে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই হলো মানুষের প্রকৃত এবাদত। এই এবাদত করার জন্য শুধু বহিঃশত্রুই নয়, আপন লোকের সাথেও লড়াই কোরেছেন অবতাররা, মহামানবরা। তারা বসে বসে শুধু স্রষ্টার পূজা করেন নি, কার্যত তারা যা করেছেন সম্পূর্ণটাই ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবতার জন্য। তাদের জীবন ছিল সংগ্রামী, বহির্মুখী। বুদ্ধ (আ) এর কীসের অভাব ছিল? তিনি কি পারতেন না তার সম্পদশালী পিতাকে বলে রাজভবনের কোনো এক জায়গায় একটি মন্দির বা উপাসনালয় নির্মাণ করে আরাধনা, পূজা-অর্চনা করতে? বেশ পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি রাজ্য, স্ত্রী-সন্তান, সুখ, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে মানুষের দুঃখের কারণ কী, দুঃখ নিবারণের উপায় কী- তা সন্ধান করার জন্য অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি হাসিমুখে গৃহত্যাগ করেছেন কেবলমাত্র মানুষের শান্তির উপায় অন্বেষণ করার জন্য, মানবতার তাগিদে। অথচ তার অনুসারীরা আজ কী করছে?

কৃষ্ণ (আ:) জেহাদ করলেন আপন মামার বিরুদ্ধে, যুধিষ্ঠির (আ:) জেহাদ করলেন আপন চাচার সাথে, এব্রাহীম (আ:) জেহাদ কোরলেন তাঁর বাবার বিরুদ্ধে, মোহাম্মদ (দ:) জেহাদ কোরলেন চাচাদের বিরুদ্ধে। এটাই হলো মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জেহাদ, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অশান্তিকে শান্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা (জেহাদ)। এটাই মানবতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা এত বড় ত্যাগ সাধন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা অবতার, পবিত্র, নিষ্পাপ, মহামানব। কিন্তু তাঁরা যে সংগ্রাম কোরে মানবজাতির মধ্যে শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা কোরে গেলেন বর্তমান মানবজাতির কাছে তাঁদের সেই কৃত সংগ্রামের কোনো মূল্যই নেই, কোনো অর্থই নেই। সংগ্রামী অবতার-নবী-রসুলদের অনুসারীরা প্রকৃত ধর্মের সংজ্ঞাই পরিবর্তন কোরে ফেলেছেন, মানবতার কল্যাণ নয় বরং উপাসনা, পূজা-অর্চনা, নামাজ-রোজাই তাদের কাছে ধর্ম-কর্ম সাব্যস্ত হয়েছে। সত্যের কি নিদারুন বিকৃতি!

ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থার....

২১ পৃষ্ঠার পর: তখন তারা কাদের হাতে শাসনভার ছেড়ে যাবে তা নিয়ে মোটেও তাদের চিন্তা কোরতে হোলো না। একে তো ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটি শাসন করার যোগ্য নয়, এমনকি শাসন করার ব্যাপারে আগ্রহীও নয় (বর্তমানেও এদের উত্তরসূরিদের একটা অংশ তাই মনে করে। এরা মনে করে শাসন যে-ই করুক, আমরা ধর্ম-কর্ম করতে পারলেই চোলবে), আর সাধারণ মূর্খ জনতার হাতে শাসনদণ্ড ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, বাকি থাকে নিজেদের হাতে গড়া সাধারণ শিক্ষিত অংশটি। এদের হাতে শাসনভার ছেড়ে যাওয়ার লাভ বহুমুখী। একে তো তারা প্রভু বোলতে অজ্ঞান, তাছাড়া প্রভুরা না থাকলেও তারা যে প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করেই চোলবে এ ব্যাপারে প্রভুরা একেবারেই নিশ্চিত ছিলেন। এরাই প্রভুদের অনুপস্থিতিতে শাসনভার পাওয়ার অধিকারী এবং পাশ্চাত্য প্রভুরা আগে থেকেই তাদের জন্য এ ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে, তার একটি বড় প্রমাণ তাদেরকে অধিকার আদায়ের পথ শিক্ষা দেওয়ার নামে তাদের পছন্দসই রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া। এই প্রভুদেরই একজন, এলান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume. 1829-1912) নামে কথিত 'ভারতপ্রেমী' ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (Indian National Congress) নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে এদেশীয় শিক্ষিত শ্রেণিটিকে এদেশীয়দের অধিকার আদায়ের রাজনীতি শিক্ষা প্রদান করেন। অবাক করা ব্যাপার এই যে তিনি তাদের কাছে 'ভারতপ্রেমী' নামে পরিচিত। তার কাছ থেকেই এই রাজনীতিকরা পাশ্চাত্য প্রভুদের তৈরি পদ্ধতিতে রাজনীতি শিক্ষা লাভ করেছেন। এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই বর্তমানের রাজনীতিকরাও তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের ঘৃণা কুড়ানো এই রাজনীতিকরা তাদেরই বর্তমান উত্তরসূরি।

কাল অতিবাহিত হোয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রতি প্রভুদের পূর্ব মানসিকতা এখনো যায় নি। আমাদের সম্পদ থেকে শোষণ করার মানসিকতা এখনও পর্যন্ত তাদের দূর হয় নি। ঐ সময়ে নিয়েছে জোর করে আর এখন নেয় নেতা-নেত্রীদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার নামে আঁতাত করে। যারা তাদের স্বার্থ রক্ষা কোরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারাই তাদের আনুকূল্য পায়। আর এই আনুকূল্যের রসদ হোচ্ছে আমাদের নেতাদের বিভিন্ন দাসত্ব চুক্তি, দাসখত।

যাই হোক, গোলামি যুগে প্রভুরা আমাদেরকে যে রাজনীতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন আমরা নির্দিধায় আজও তা চর্চা করে যাচ্ছি। অথচ এই System-এর ভিত্তিতেই অনৈক্য প্রোথিত হোয়ে আছে। আর এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে ঐক্যই সমৃদ্ধি আর অনৈক্য ডেকে আনে ধ্বংস। বাস্তবতা হোচ্ছে এই শিক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা যা একমাত্র গোলামদের জন্যই প্রযোজ্য, অনুগত দাসদের বিদ্রোহ করার পরিবর্তে গোলামিতে ব্যস্ত রাখতে এটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ জন্যই এটি সাম্রাজ্যবাদীরা বার বার তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূ-খণ্ডে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরছে।

ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হোয়ে আজকের শিক্ষিত শ্রেণিটির অধিকাংশই হোয়ে গেছে ধর্মহীন, স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন, বস্তুবাদী, আত্মকেন্দ্রীক, ভোগ-বিলাসী, পাশ্চাত্যদের অনুকরণকারী অতি প্রভুভক্ত একটি প্রাণি বিশেষ। এখন তাদেরই ষড়যন্ত্রমূলক তন্ত্র-মন্ত্রকে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরে একদিকে ঐ চরিত্রহীন শিক্ষিত শ্রেণিটি আমাদেরকে করেছে শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত, অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত কূপমণ্ডুক ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে ঐক্যের পরিবর্তে শত-সহস্র মজহাব-ফেরকায় বিভক্ত করেছে। তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে আমরা এক ভাই আরেক ভাইয়ের রক্তে হলি খেলছি, নিজেদের সম্পদ নিজেরাই ধ্বংস করে চলেছি, আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রুতে পরিণত হোয়েছি; এভাবে আজ আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হোয়েছি।

জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এখন একান্ত প্রয়োজন সকল অনৈক্য, বিভেদ-ব্যবধান ভুলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঐক্যকে ফিরিয়ে আনা। তাহোলেই সম্ভব হবে পৃথিবীর বুকে আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন একটি জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। আমরা এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারী হেযবুত তওহীদের সদস্যরা সেই ঐক্যের আহ্বানই করছি মানবজাতিকে।

[ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী রচিত, "ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা" পড়ার জন্য অনুরোধ রোইল।] ■

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

মানবজাতির প্রকৃত অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক শক্তিগুলিই একেকটি ফেরেশতা যাদেরকে সনাতন ধর্মে দেব দেবী বোলে বিশ্বাস করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থগুলি ও বিজ্ঞান একমত যে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে স্রষ্টা এই বিপুল বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি কোরেছেন। এই বিশাল সৃষ্টিকে তিনি প্রশাসন ও পরিচালনা কোরতেন এবং করেন তাঁর অসংখ্য মালায়েকদের দিয়ে যাদের আমরা বোলি ফেরেশতা- ফারসি ভাষায়, ইংরেজিতে Angel। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, প্রচলিত বিশ্বাস, পৌরাণিক মিথ এবং ইতিহাসসহ যাবতীয় তথ্য উপাত্ত ইত্যাদি একত্র কোরে গবেষণা কোরলে একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, ভারতীয়, রোমান এবং গ্রীকরা যে দেব-দেবী gods, goddess বিশ্বাস করেন সেগুলো এবং মালায়েক বা ফেরেশতা একই জিনিস। সংখ্যায় এরা অগণ্য এবং এরা আসলে প্রাকৃতিক শক্তি, যে শক্তি দিয়ে আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন এবং এদের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। আল্লাহ যাকে যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, যাকে যে কর্তব্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন; সে ফেরেশতা সামান্যতম বিচ্যুতি না কোরে তা যথাযথ কোরে যাচ্ছেন। আসলে কোন বিচ্যুতি হোতে পারে না- কারণ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কোন স্বাধীন ইচ্ছাই নেই। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি মালায়েক। এর উপর স্রষ্টা কর্তব্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন সমস্ত কিছুকে আকর্ষণ কোরে ধোরে রাখার। সৃষ্টির প্রথম থেকে এই ফেরেশতা তার কর্তব্য কোরে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত কোরে যাবেন। তার এতটুকু ইচ্ছা শক্তি নেই যে, এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্যও তিনি এই কাজের বিরতি দেন, সে ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ তাকে দেন নি। এমনি আগুন, বাতাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলি- ফেরেশতা, দেব-দেবী, অন্যান্য ধর্মে যেমন দেব-দেবীরা কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির ভারপ্রাপ্ত, যেমন হিন্দু শাস্ত্রে বরুণ বাতাসের দেবতা, সূর্য একটি দেবতা- সূর্যদেব, গ্রীকদের নেপচুন সমুদ্রের, পানির দেবতা, রোমানদের ভালকান হোচ্ছেন আগুনের দেবতা, তেমনি এসলাম ধর্মেও বিভিন্ন কাজে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। আজরাইলকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের মৃত্যুর সময় এলে জান কবজ করার। এই ফেরেশতা ত্রুটিহীনভাবে তার দায়িত্ব পালন কোরে যাচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্যও তার সাধ্য নেই এই কাজ থেকে বিরত থাকার। সনাতন ধর্মে এই মৃত্যুদূতকে বলা হয় যমরাজ, জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মে বলা হয় মারিয়া। গ্রীক পুরাণে আকাশ ও বজ্রের দেবতা হোচ্ছেন দেবরাজ জিউস, আর বৈদিক ধর্মে দেবরাজ বলা হয় ইন্দ্রকে যার অস্ত্রও সেই বজ্র। এসলাম ও বাইবেল মতে মিকাইল (মাইকেল) নিয়োজিত বৃষ্টি ঝরানোর কাজে, বজ্রও তার নিয়ন্ত্রণে। এভাবে জিব্রাইল, এস্রাফিল, কেরামান-কাতেবিন তারাও অনবরতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন কোরে চোলেছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত/পালি ভাষায় এদের বোঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হোয়েছে দেব (Deva), দেবতা, দেবপুত্র ইত্যাদি। আরও মিল আছে। সব ধর্ম মতেই এরা সংখ্যায় বিশাল-স্বভাবতঃই, কারণ এই অসীম সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক শক্তিও অসংখ্য। ভারতীয় ধর্মগুলিতে এদের সংখ্যা ধরা হয় তেত্রিশ কোটি। সংস্কৃতে কোটি শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ ছাড়াও আরো অনেক অর্থ আছে। সংস্কৃতে কোটি শব্দের অর্থ হোল অনন্ত, চরম, অসংখ্য, অসীম, কল্পনা (বিশাল ধারণা)।

খ্রিস্টানরাও এদের সংখ্যা বলেন কোটির অংকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যাজক পণ্ডিত অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus) তো হিসেব কোরে (কেমন কোরে হিসাব কোরলেন আল্লাহই জানেন) বের কোরেই ফেললেন যে Angel অর্থাৎ ফেরেশতার সঠিক সংখ্যা হোচ্ছে ঊনচল্লিশ কোটি, নিরানব্বই লক্ষ, বিশ হাজার চার জন- হিন্দুদের চেয়ে সাত কোটির মত বেশি। জাপানের শিনটো ধর্মে দেব-দেবীর সংখ্যা আশি লক্ষ। মেরাজে যেয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) দেখেছিলেন যে, বায়তুল মামুর সমজিদে হাজার হাজার ফেরেশতারা একদিক দিয়ে ঢুকছেন, সালাহ কায়েম কোরে আরেক দিক দিয়ে বের হোয়ে যাচ্ছেন। তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বোলতে যেয়ে তিনি বোলেছেন একবার যারা সালাহ কায়েম কোরে বের হোয়ে যাচ্ছে তাদের আর দ্বিতীয় বার সালাহ কায়েম করার সুযোগ আসবে না (হাদিস- আনাস (রা:) থেকে সাবেত আল বুতানী, মোসলেম, মেশকাত) অর্থাৎ অসংখ্য। অসীম সময় থেকে আল্লাহ তাঁর বিশাল সৃষ্টিকে তাঁর অসংখ্য মালায়েকদের (প্রাকৃতিক শক্তি) দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে প্রশাসন ও পরিচালনা কোরে আসছিলেন। তারপর এক সময়ে তাঁর ইচ্ছা হোল মানুষ সৃষ্টির। তাঁর এই ইচ্ছা কেন তা আমার জানা নেই। কারো জানা আছে কিনা তাও জানা নেই। তাঁর বাণীতে তিনি কিছু আভাস মাত্র দিয়েছেন। একবার বোলেছেন- এ সৃষ্টি আমি সময় কাটাবার জন্য কোরি নি (সুরা আল মুলক)। অবশ্যই- কারণ সময়ই যার সৃষ্টি তাঁর আবার তা কাটাবার প্রশ্ন

কোথায়? আবার বোলেছেন- তিনি পরীক্ষা কোরে দেখতে চান তোমাদের মধ্যে কারা ভালো কাজ করে (সুরা আল মুল্‌ক)। মোট কথা একমাত্র তিনিই জানেন, কেন তিনি এই বিশ্বজগৎ ও বিশেষ কোরে একাধারে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি কোরলেন (সুরা আত্ ত্বীন ৪-৫)। কিন্তু এ সত্য এড়াবার উপায় নেই যে সৃষ্টি তিনি কোরেছেন। ঐ সময়টার কথা বোলতে যেয়ে তিনি কোর'আনে আমাদের যা বোলেছেন তা এই যে, যখন আল্লাহ তাঁর মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের বোললেন যে আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি কোরতে ইচ্ছা কোরেছি তখন তারা বোললেন- কী দরকার তোমার প্রতিভূ সৃষ্টি করার? ওরাতো পৃথিবীতে ফাসাদ, অশান্তি আর রক্তপাত কোরবে (কোর'আন-সুরা আল বাকারা ৩০)। মালায়েকদের এই উত্তরের মধ্যে নিহিত রোয়েছে সৃষ্টি রহস্যের একটা বড় অংশ। কাজেই এটাকে একটু ভালোভাবে বুঝে নেয়া যাক।

এসলাম, জুডিয় ও খ্রিস্টান ধর্মমতে আদমের (আ:) এক ছেলে কাবিল আরেক ছেলে হাবিলকে হত্যা কোরেছিলো। ঐ প্রথম রক্তপাত থেকে যে রক্তপাত মানুষ জাতির মধ্যে শুরু তা আজ পর্যন্ত থামে নি। বরং এই অশান্তি ও রক্তপাত আজ পর্যন্ত মানুষজাতির জন্য সর্বপ্রধান সমস্যা হোয়ে আছে। শত চেষ্টা কোরেও, লীগ অব নেশনস কোরেও, কোটি কোটি মানুষের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই প্রায় সাড়ে আট কোটি আদম সন্তান জীবন হারায়। এদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটিই হোল বেসামরিক মানুষ। তৎকালীন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এই নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪ জন। পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ছিল এটি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। নতুন এই শতাব্দীতে যুদ্ধ-রক্তপাতহীন একটি দিনও অতিবাহিত হয় নি। এই শতাব্দীর শুরুতে শুধু এক ইরাকেই দশ লক্ষাধিক মানুষ যুদ্ধের বলি হয়। সামান্য পরিমাণ মানবতাবোধ না থাকার দরুন অবুঝ শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী মহিলারা পর্যন্ত এই সকল যুদ্ধের নৃশংসতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মানুষ শান্তিতে বসবাস কোরছে। যতই দিন যাচ্ছে মানবজাতি ততই ফাসাদ-সাফাকুদ্দিমার নতুন নতুন পর্ব অতিক্রম কোরে ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চোলেছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্যাই মানুষ জাতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে আজ তার অস্তিত্বই প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বসাকুল্যে একথা বলা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে মালায়েকরা যে যুক্তিগুলো আল্লাহর কাছে পেশ কোরেছিলেন তার প্রত্যেকটি বর্তমানে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হোচ্ছে।

আল্লাহ-মানুষ-এবলিস

ফেরেশতারা যে দু'টি শব্দ মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার কোরেছিলেন তার একটা ফাসাদ, যার অর্থ অবিচার, অশান্তি, অন্যায় ইত্যাদি। অন্যটি রক্তপাত। দুটো মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় মানুষ অন্যায়, অশান্তি আর রক্তপাত কোরবে। সত্যই তাই হোয়েছে, আদমের (আ:) ছেলে থেকে আজ পর্যন্ত শুধু ঐ রক্তপাতই নয়, অশান্তি, অন্যায়, অবিচারও বন্ধ হয় নি, এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই অন্যায়, অশান্তি, অবিচার আর রক্তপাত, যুদ্ধ- মানুষ শত চেষ্টা কোরেও বন্ধ কোরতে পারে নি। শুধু তাই নয়, এই সমস্যাই মানুষ জাতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে আজ তার অস্তিত্বই প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে **মালায়েকরা এ কথা বলেন নি যে মানুষ মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, প্যাগোডায়, সিনাগগে যেয়ে তোমার উপাসনা কোরবে না, উপবাস কোরবে না**। তারা এসবের একটাও বলেন নি। বোলেছেন অশান্তি, অন্যায়, ঝগড়া আর রক্তপাত কোরবে। অর্থাৎ আসল সমস্যা ওটা নয়, এইটা। আল্লাহ কি বোঝেন নি মালায়েকরা কী বোলেছিলেন? তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য কোরে মানুষ বানালেন। তারপর আল্লাহ আদমের দেহের মধ্যে তাঁর নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা আল হিজর ২৯)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, শব্দ ব্যবহার কোরেছেন আমার আত্মা, স্বয়ং স্রষ্টার আত্মা। অর্থাৎ আল্লাহর যত রকম গুণাবলী, সিফত আছে সব মানুষের মধ্যে চলে এলো। এমনকি তার যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এটাও ঐ আত্মার সঙ্গে মানুষের মধ্যে চলে এলো। আল্লাহর এই গুণ, এই শক্তিগুলি সৃষ্টির আর কারো নাই- ফেরেশতা, মালায়েকদেরও নেই- সব তাঁর বেঁধে দেওয়া আইন, নিয়ম মেনে চোলছে। এইগুলিকেই আমরা বলি প্রাকৃতিক নিয়ম। কারো সাধ্য নেই এই নিয়ম থেকে এক চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম করে। কারণ তা করার ইচ্ছাশক্তিই তাদের দেয়া হয় নি। ইচ্ছা হোলে কোরব, ইচ্ছা না হোলে কোরব না, এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা মানুষের মধ্যে ফুঁকে দেয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ লক্ষ কোটি সৃষ্টির আরেকটি মাত্র ছিলো। কিন্তু স্রষ্টার আত্মা তার মধ্যে ফুঁকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এক অনন্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হোয়ে গেলো। সে হোয়ে গেলো স্রষ্টার, আল্লাহর প্রতিনিধি যার মধ্যে রোয়েছে সেই মহান স্রষ্টার প্রত্যেকটি গুণ, শুধুমাত্র গুণ নয় প্রত্যেকটি শক্তি। শুধু তফাৎ এই যে, অতি সামান্য পরিমাণে। ব্যাখ্যা কোরতে গেলে বোলতে হয়- মহাসমুদ্র থেকে এক ফোঁটা পানি তুলে এনে তার যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যায় তবে ঐ এক ফোঁটা পানির মধ্যে সেই মহাসমুদ্রের পানির প্রত্যেকটি গুণ পাওয়া যাবে, মহাসমুদ্রের মধ্যে যত পদার্থ আছে তার প্রত্যেকটি পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু ঐ এক ফোঁটা পানি মহাসমুদ্র নয়-সে প্রলয়ংকর ঝড় তুলতে পারে না, জাহাজ ডোবাতে পারবে না।

দ্বিতীয় হোল:- স্রষ্টা তাঁর এই নতুন সৃষ্টিটাকে সব জিনিসের নাম শেখালেন (আল বাকারা ৩১)। এর অর্থ হলো তিনি যা সৃষ্টি কোরেছেন সেই সব জিনিসের ধর্ম (Property), কোন জিনিসের কি কাজ, কেমন কোরে সে জিনিস কাজ করে ইত্যাদি, এক কথায় বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি কোরে তিনি তাঁর বিশাল সৃষ্টি কোরেছেন, মানুষকে সেই বিজ্ঞান শেখালেন। এই কথা বোলে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, **মানুষ জাতি সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কোরবে।**

তৃতীয় হলো:- আল্লাহ তাঁর মালায়েকদের ডেকে হুকুম কোরলেন তাঁর এই নতুন সৃষ্টি আদম অর্থাৎ মানুষকে সাজদা কোরতে। এবলিস ছাড়া আর সমস্ত মালায়েক মানুষকে সাজদা কোরলেন (আল বাকারা ৩৪)। এর অর্থ কী? এর অর্থ প্রথমতঃ ফেরেশতারা মানুষকে তাদের চেয়ে বড়, বেশি উচ্চ বোলে মেনে নিলেন, কারণ তার মধ্যে

আল্লাহর আত্মা আছে যা তাদের মধ্যে নেই। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আল্লাহ মানুষের খেদমতে নিযুক্ত কোরে দিলেন। আগুন, পানি, বাতাস, বিদ্যুৎ, চুম্বক, মাটি ইত্যাদি লক্ষ কোটি মালায়েক তাই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। একমাত্র এবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য কোরে আদমকে (আ:) সাজদা করলো না।

এবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য কোরতে পারলো কারণ মূলতঃ এবলিস ছিলো একজন জ্বীন- মালায়েক নয়। কঠিন এবাদত ও রেয়াযত কোরে পরে সে মালায়েকের স্তরে উন্নীত হয়। আগুনের তৈরি বোলে তার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি না থাকলেও অহঙ্কার তখনো বজায় ছিলো, যা সে অত সাধনা কোরেও নিশ্চিহ্ন কোরতে পারে নি। মাটির তৈরি আদমকে সাজদা কোরতে বলায় তার ঐ অহঙ্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো বোলেই সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিলো যে, তুমি যদি আমাকে এই শক্তি দাও যে আমি মাটির তৈরি তোমার ঐ সৃষ্টিটার দেহের, মনের ভেতর প্রবেশ কোরতে পারি তবে আমি প্রমাণ কোরে দেখাবো যে, ঐ সৃষ্টি তোমাকে অস্বীকার কোরবে। আমি যেমন এতদিন তোমাকে প্রভু স্বীকার কোরে তোমার আদেশ মত চলেছি, এ তেমন চোলবে না। আল্লাহ এবলিসের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরলেন। তাকে আদমের দেহ, মন, মস্তিষ্কে প্রবেশ কোরে আল্লাহকে অস্বীকার করার, তাঁর অবাধ্য হবার প্ররোচনা দেবার শক্তি দিলেন (সুরা আল বাকারা ৩৬, সুরা আন নিসা ১১৯)।

এর পরের ঘটনাগুলো অতি সংক্ষেপে এই যে, আল্লাহ তার প্রতিভু আদমের জন্য তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি কোরলেন, তাদের জান্নাতে বাস কোরতে দিলেন একটি মাত্র নিষেধ আরোপ কোরে। আল্লাহর অনুমতি পেয়ে এবলিস আদম ও হাওয়ার মধ্যে প্রবেশ কোরে তাদের প্ররোচনা দিয়ে ঐ একটিমাত্র নিষেধকেই অমান্য করালো, যার ফলে আল্লাহ তাদের জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নির্বাসন দিলেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সুরা আল বাকারা ৩৬) -অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত। আর বোললেন- **নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য পথ-প্রদর্শক পাঠাবো** (সুরা আল বাকারা ৩৮)।

প্রশ্ন হোতে পারে- যে মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন তাকে পথ-প্রদর্শন কোরতে হবে কেন? এই জন্য হবে যে মানুষ নিজে তার পথ খুঁজে নিজের জন্য একটি জীবনব্যবস্থা তৈরি কোরে নিতে পারতো যদি কী কী প্রাকৃতিক নিয়মে এই সৃষ্টি হোয়েছে, চোলছে তার সবই যদি সে জানতো। কিন্তু তা সে জানেনা। দ্বিতীয়তঃ এবলিস তো তার মধ্যে বোসে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে প্ররোচনা দিয়ে চোলেছেই। তার চেয়ে বড় কারণ, ঐ এবলিসের চ্যালেঞ্জ- মানুষকে দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার কোরিয়ে, আল্লাহর দেয়া জীবন পথকে বর্জন কোরিয়ে নিজেদের জন্য জীবনব্যবস্থা তৈরি কোরিয়ে তাই মেনে চলা- যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অন্যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত। আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থা পাঠিয়ে বোলছেন আমাকে **একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিধানদাতা বোলে বিশ্বাস কোরে, এই জীবনব্যবস্থা মত তোমাদের জাতীয়, পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা কর,** তাহোলে তোমাদের ভয় নেই (সুরা আল বাকারা ৩৮)। কিসের ভয় নেই? ঐ ফ্যাসাদ, অশান্তি, রক্তপাতের এবং পরবর্তীতে জাহান্নামের ভয় নেই। যে জীবনব্যবস্থা দীন আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে বার বার পাঠালেন- এর নাম, স্রষ্টা নিজে রাখলেন শান্তি, আরবি ভাষায় এসলাম। অর্থ - **এই দীন, জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা কোরলে তার ফল শান্তি, জাতীয়, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি, এসলাম। না কোরলে অশান্তি, অন্যায়, অবিচার মানুষে মানুষে যুদ্ধ, রক্তপাত**- মানুষ তৈরির বিরুদ্ধে মালায়েকরা যে কারণ পেশ কোরেছিলেন আল্লাহর কাছে। তাই সেই আদম (আ:) থেকে শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত যতবার নবীর মাধ্যমে এই জীবনব্যবস্থা তিনি পাঠালেন, সবগুলির ঐ একই নাম এসলাম-শান্তি।

আল্লাহর আনুগত্যই সকল ধর্মের মূলকথা

আল্লাহ তাঁর প্রতিভূ আদমকে (আ:) সৃষ্টি কোরে তার স্ত্রীসহ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। বোলে দিলেন- যাও, ওখানে বংশ বৃদ্ধি কর। তোমরা ওখানে তোমাদের সামগ্রিক জীবন কেমন কোরে পরিচালিত কোরলে অন্যায়-অবিচার, রক্তপাতহীন অবস্থায় বাঁচতে পারবে সে পথ প্রদর্শন আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব। **অর্থাৎ মানুষকে শান্তিতে থাকতে হোলে যে রকম জীবন-ব্যবস্থায় থাকতে হবে সে ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার তিনি নিজে নিলেন।** স্রষ্টা যে কাজের দায়িত্ব নিলেন তাতে যে তিনি ব্যর্থ হবেন না, তা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার পর তার প্রথম সৃষ্টি আদমকে (আ:) দিলেন তাঁর জীবন-ব্যবস্থা। আমরা ধোরে নিতে পারি এ ব্যবস্থা ছিলো ছোট, সংক্ষিপ্ত- কারণ তখন অল্প সংখ্যক নর-নারীর জন্যই ব্যবস্থা দিতে হোয়েছিলো। আদম (আ:) এবং তাঁর পুত্র কন্যা ও নাতি-নাতনিদের জন্য এবং সমস্যাও নিশ্চয়ই ছিলো সীমিত। কিন্তু তারপর আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বংশ বৃদ্ধি চোললো। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আদমের (আ:) সন্তানরা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, ফলে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়লো। স্রষ্টা কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ভুলেন নি। বনি-আদমের বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে তিনি তাঁর প্রেরিত পাঠিয়ে তাদের জন্য জীবনব্যবস্থা পাঠাতে থাকলেন- যে ব্যবস্থা অনুসরণ কোরলে তারা নিজেদের মধ্যে অশান্তি, ফাসাদ, রক্তপাত না কোরে শান্তিতে, এসলামে বাস কোরতে পারে। এদিকে এবলিস অর্থাৎ শয়তানও ভুললো না তার প্রতিশ্রুত কাজ। সেও প্রতিটি বনি-আদমের দেহ-মনের মধ্যে বোসে তাকে নানা রকম বুদ্ধি পরামর্শ দিতে থাকলো, নতুন নতুন উপায় বাতলাতে থাকলো যাতে মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, অন্ততপক্ষে বিকৃত করে; এবং ফলে সেই অন্যায়, ফাসাদ আর রক্তারক্তিতে জড়িত হোয়ে পড়ে। যখনই এবলিস কোন জন সমাজে সফল হোয়েছে তখনই আল্লাহ সেখানে নতুন একজন প্রেরিত পাঠিয়েছেন সেটাকে সংশোধন কোরতে (সুরা আন নহল ৩৬)।

এখন দেখা দরকার যে, বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন সেটা মূলতঃ কী? পর্যবেক্ষণ কোরলে দেখা যায় এর মূল ভিত্তি হোচ্ছে- **স্রষ্টাকে, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, শুধু একমাত্র প্রভু নয়, সর্বময় প্রভু বোলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।** এই ব্যাপারে তিনি

নিজের সম্বন্ধে যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন সেটা হলো 'এলাহ'। বর্তমানে এর অনুবাদ করা হয় 'উপাস্য' শব্দ দিয়ে। এই উপাস্য শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ হয় না। কারণ হোচ্ছে এই যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। যার একটা বিকৃতি হলো আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জাতীয় ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলিতে সীমাবদ্ধ কোরে রাখা; এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনা তার অন্যতম। শুধু 'এলাহ' শব্দ আল্লাহ এ অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন তা হল- **যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলঙ্ঘনীয়**। আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর সময় এই বিশ্বাসের মূলমন্ত্র রাখা হোয়েছে-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই (লা এলাহা এল্লাল্লাহ) - এবং পরে যোগ হোয়েছে তদানীন্তন নবীর নাম। এই কলেমায় মূলমন্ত্রে কখনো এই এলাহ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ স্রষ্টা ব্যবহার করেন নি। কখনো কোন নবীর সময় লা রব্ব এল্লাল্লাহ বা লা মালেক এল্লাল্লাহ বা তার নিরানব্বই নামের যে কোনটা হোতে পারতো। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষাধিক নবীর- কোন নবীর সময়ের কলেমাতেই ঐ এলাহ ছাড়া অন্য কোন নাম ব্যবহার করেন নি। কেন? এই জন্য যে তিনি 'একমাত্র' যার আদেশ নিষেধ ছাড়া আর কারো আদেশ নিষেধ গ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ কেউ যদি কতগুলি আদেশ নির্দেশ মেনে নিলো কিন্তু অন্য কতকগুলি অস্বীকার করলো, তবে তিনি আর তার এলাহ রোইলেন না। এটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কারণ যে রকম জীবনব্যবস্থা অনুসরণ কোরলে মানুষ পৃথিবীতে গোলমাল, অশান্তি, অবিচার, অন্যায়, যুদ্ধ ও রক্তপাত করা থেকে অব্যাহতি পাবে সে রকম জীবন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই যে মুখ্য ও প্রধান হবে এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। তাই আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন তার কালেমা, মূলমন্ত্র স্থির কোরে দিলেন- তাকে একমাত্র বিধানদাতা বোলে স্বীকার করার ভিত্তিতে। জীবন-বিধানের এই ভিত্তিটাকে অর্থাৎ তওহীদকে স্রষ্টা এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সেই আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে তাঁর শেষনবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত প্রত্যেককে পাঠানো হোয়েছে ঐ এক দাবি দিয়ে- আমাকে ছাড়া কাউকে প্রভু বোলে, এলাহ বোলে মানবে না। অন্য কারো দেয়া বিধান, আদেশ-নিষেধ মানবে না। মানলে তাদের আমি কিছুতেই মাফ করবো না। কিন্তু ঐ একটি মাত্র দাবি মেনে নিলে আর কোন গোনাহ, পাপের জন্য শাস্তি দেব না (সুরা আন নিসা ৪৮, ১১০, ১১৬)।

এখন দেখা যাক এই যে জীবনব্যবস্থা স্রষ্টা যুগে যুগে পাঠিয়েছেন এটা কী? লক্ষ্য কোরলে দেখা যায় এর ভিত্তি ঐ তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যা চিরস্থায়ী। অন্যভাগ আদেশ-নিষেধ, যেগুলি মেনে চোললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগতভাবে মানুষ পরিপূর্ণ শান্তিতে, প্রগতিতে বাস কোরতে পারে। এই দ্বিতীয় ভাগটি চিরস্থায়ী, সনাতন নয়, এটি স্থান ও কালের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর নবী পাঠিয়ে যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তাতে স্বভাবতঃই স্থান, কাল, পাত্র ও সমস্যাভেদে বিভিন্ন নির্দেশ থেকেছে। আর দু'টি ভাগ এতে সব সময় থেকেছে- সেটা উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার ভাগ। উদ্দেশ্য সব সময়ই একই থেকেছে-শান্তিতে সুবিচারে বসবাস এবং এ উদ্দেশ্য অর্জন কোরতে যে সমস্ত প্রক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য। এই প্রধান চারটি ভাগকে একত্র কোরে দেখলে পরিস্ফুট হোয়ে উঠবে যে, আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ কোরবে। তা যদি না হতো তবে তা মানুষের জন্য জীবন-বিধান হোতে পারতো না, হোলেও অসম্পূর্ণ ও আংশিক হোত। অর্থাৎ আল্লাহকে "একমাত্র জীবন-বিধাতা" স্বীকার ও গ্রহণ করার পর জীবনের কোন অঙ্গনে (Facet) অন্য কোন বিধান অর্থাৎ আইন স্বীকার করার অর্থ হলো তাকে ছাড়াও অন্য বিধাতা স্বীকার কোরে নেওয়া- শেরক।

এই যে যুগে যুগে প্রভু আল্লাহ আমাদের জন্য জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন তা তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর নবীদের মাধ্যমে- যারা আমাদেরই মত মানুষ। এখানে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। যেহেতু ঐ প্রেরিতরা আমাদের মত মানুষ কাজেই যখন তাঁরা ঘোষণা কোরেছেন যে তাঁকে জীবন-বিধান দিয়ে পাঠানো হোয়েছে তখন তঁর কথা সত্য কি মিথ্যা তা স্বভাবতঃই প্রশ্নের ব্যাপার হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ যদি এ কথা প্রশ্ন কোরে যে, এই লোকটি তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য, নেতৃত্ব লাভের জন্য বা তাঁর মনগড়া কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য স্রষ্টার দোহাই দিচ্ছে না তার প্রমাণ কি? এ প্রশ্ন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। কাজেই আল্লাহ এ ব্যাপারেও তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে রকমের ব্যবস্থা নিয়েছেন তার প্রেরিতদের সম্বন্ধেও সেই রকম ব্যবস্থা নিলেন। অর্থাৎ চিহ্ন। তিনি তাঁর প্রেরিতদের মধ্যে, তাদের কাজের মধ্যে এমন সব চিহ্ন দিয়ে দিলেন যা যে কোন যুক্তিসম্পন্ন মানুষের সন্দেহ নিরসন করার জন্য যথেষ্ট। সংগত কারণে তিনি তাঁর প্রতিটি নবীকেই অলৌকিক শক্তি দিলেন যা সাধারণ মানুষের থাকে না। এগুলোর নাম তিনি দিলেন চিহ্ন-আয়াত। আমরা এখন বলি মো'জেজা, অলৌকিক ঘটনা বা বিভূতি। যাদের জন্য এই নবীরা জীবন-ব্যবস্থা, দীন নিয়ে এসেছেন তারা তাঁর কথায় সন্দেহ বা অবিশ্বাস কোরলে তিনি ঐ অলৌকিক কাজ কোরে তাদের সন্দেহ অপনোদন কোরেছেন।

এমনি কোরে যুগে যুগে, যখনই জাতি জনগোষ্ঠী আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা হয় ত্যাগ কোরেছে না হয় তাকে এমন বিকৃত কোরে ফেলেছে যে তা আর তাদের শান্তি, এসলাম দিতে পারে নি, তখনই স্রষ্টা তাঁর করুণায় আরেক নবী পাঠিয়েছেন (হাদিস- ইবনে মাসুদ (রা:) থেকে মুসলিম, মেশকাত)। তিনি এসে বোলেছেন- তোমরা আমার পূর্ববর্তী নবীর আনা জীবন-বিধান বিকৃত কোরে ফেলেছো। তাই আমাকে পাঠানো হোয়েছে তোমাদের জন্য নতুন বিধান দিয়ে। শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই নতুন প্রেরিতের কথায়, কাজে তাঁর জীবন-ধারায় ও তাঁর অলৌকিক কাজ করার শক্তি দেখে তাঁকে বিশ্বাস কোরে এই নতুন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরেছে। আর কিছু লোক শয়তানের প্ররোচনায় তাঁকে অস্বীকার কোরে আগের বিকৃত দীনকে আঁকড়ে ধোরে রেখেছে। পৃথিবীতে আরেকটি দীন, জীবন-ব্যবস্থার জন্ম হোয়েছে। তারপর এবলিসের-প্ররোচনায় এই নতুন দীনেও বিকৃতি এসেছে এবং এতখানি বিকৃতি এসেছে যে ওটাও আর মানুষকে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে পারে নি। তখন আল্লাহ আবার এক নতুন রসুল পাঠিয়েছেন- আগের মত কোরে আবার এক দীন, ধর্ম পৃথিবীতে সংযোজন হোয়েছে। এমনি কোরে মানবজাতির শান্তির জন্য আল্লাহ লক্ষাধিক

প্রেরিত পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য- সেই এক। মানুষ যাতে নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি না কোরে, অবিচার না কোরে, যুদ্ধ, রক্তপাত না কোরে পূর্ণ শান্তিতে পৃথিবীতে বসবাস করে। যখনই কোন জনগোষ্ঠী, জাতি কোন প্রেরিতকে বিশ্বাস কোরে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরে তা তাদের জাতীয়, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা কোরেছে তখন তাদের মধ্যকার সমস্ত অশান্তি, অবিচার, মারামারি, রক্তপাত বন্ধ হোয়ে গেছে। তারা অনাবিল সুখ ও শান্তিতে, এসলামে বাস কোরতে লেগেছে। কিন্তু এই শান্তি চিরস্থায়ী হয় নি, কারণ শয়তানও বোসে ছিল না এবং বোসে নেই। সে অবিশ্রান্তভাবে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে ঐ জীবন-ব্যবস্থাকে বিকৃত কোরে, অচল কোরে দিয়ে পরিণতিতে মানুষকে আবার ঐ ফাসাদ আর রক্তপাতে জড়িত কোরতে এবং কোরেছেও।

বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হোল?

অতীতের দিকে ফিরে চাইলে আমরা দেখি যে মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্ব ঠিক রেখে যুগে যুগে যে এসলাম পৃথিবীতে এসেছে তার রূপ কিছু কিছু বিভিন্ন হোয়েছে- এবং যে সব ব্যাপারে বিভিন্ন হোয়েছে তা সবই স্থান, কাল ও পাত্রের অধীন। উদাহরণ রূপে আদমের (আ:) উপর যে এসলাম দেয়া হোয়েছিলো তাতে বিধান ছিলো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে। স্বভাবতঃই, কারণ তখন তারা ছাড়া পৃথিবীতে আর মানুষ ছিল না। কিন্তু পরে যখন মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলো, তারা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আর সে প্রয়োজন রোইলো না এবং পরবর্তী যে সব নবীরা এলেন তাদের উপর বিধানগুলিতে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ কোরে দেয়া হলো। অনুরূপভাবে আস্তে আস্তে যেমন মানুষ নতুন ব্যাপারে জ্ঞান লাভ কোরতে লাগলো, নতুন নতুন আবিষ্কার কোরতে লাগলো, এক কথায় মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি উন্নতি কোরতে লাগলো- তেমনি আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাতেও সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিধান দেয়া হোতে লাগলো। প্রতিবার যেখানেই নবীরা এসেছেন এবং যেখানকার মানুষ তাদের আনা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরেছে সেখানে সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। আর যেখানে মানুষ নবীদের প্রত্যাখ্যান কোরেছে সেখানে তারা অশান্তি, অবিচারে রক্তপাতে ডুবে থেকেছে এবং কালে ধ্বংস হোয়ে গেছে।

একজন নবী একটা জনসম্প্রদায়ে বা জাতিতে যখন প্রেরিত হোয়েছেন তখন তাঁকে সম্মুখীন হোতে হোয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী নবীর বিকৃত ব্যবস্থার অনুসারীদের। পূর্ববর্তী দীনকে বিকৃত করা না হোলে হয়তো তখন তাঁকে পাঠানোর প্রয়োজনই হতো না। এই দীনগুলি কেমন কোরে বিকৃত হোয়েছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণার প্রয়োজন। যখন কোন একজন নবী তাঁর কাজে সফল হোয়েছেন অর্থাৎ তাঁর আনা জীবনব্যবস্থা তাঁর সম্প্রদায় বা জাতি গ্রহণ কোরেছে, প্রতিষ্ঠা কোরেছে, তখন তার ফলে সে জাতিতে শান্তি, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায়ের পর শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ ঐ ব্যবস্থা বিকৃত কোরতে শুরু কোরেছে। এই বিকৃতিগুলোকে শ্রেণি বিন্যাস কোরলে প্রধান প্রধানগুলো হলো-

ক) নবীর ব্যক্তিত্বে, চরিত্রের মাধুর্যে মুগ্ধ, তাঁর অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত তাঁর জাতি, উম্মাহ তাঁকে অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা কোরেছে। তাদের মধ্যে অনেকে তাঁকে প্রাণ ভরে ভালোও বেসেছে। তাঁর ওফাতের পর ক্রমে ক্রমে এই ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা তাঁকে আরও উপরের আসনে বসাতে চেয়েছে। এটা একটা স্বাভাবিক মানবিক মানসিক বৃত্তি- যে যাকে যত ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে সে তাকে তত বড় কোরে দেখতে চায়, দেখাতে চায়। যদিও রসুল তাঁর জীবিতকালে নিঃসন্দেহে বার বার পরিষ্কার কোরে বোলে গেছেন যে আমি তোমাদের মতই মানুষ, শুধু আমাকে পাঠানো হোয়েছে তোমাদের জন্য জীবন-বিধান দিয়ে, কিছু অলৌকিক শক্তি দিয়ে। কাজেই আমি যা, অর্থাৎ রসুল, এর বেশি আমাকে অন্য কিছু মনে কোরোনা, কোরলে মহা অন্যায় হবে। কিন্তু অতি ভক্তি আর শয়তানের প্ররোচনায় যতই দিন গেছে ততই তাদের নবীকে উপরের দিকে ওঠাতে ওঠাতে শেষ পর্যন্ত কোন নবীকে আল্লাহর ছেলে, কোন নবীকে একেবারে আল্লাহর আসনেই বসিয়েছে।

খ) নবীরা চলে যাবার পর তাঁর জাতি, উম্মাহ, তাদের জীবনব্যবস্থাটাকে নিয়ে অতি বিশ্লেষণ কোরতে শুরু কোরেছে। যে কোন জিনিসেরই অতি বিশ্লেষণ সে জিনিসটিকে নষ্ট, ধ্বংস কোরে দেয়। তাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অতি বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন রকমের মতামত গড়ে উঠেছে, সেই মতামতের অনুসারী জুটেছে, জাতি নানা মতে বিভক্ত হোয়ে গেছে। তারপর অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই বিভক্ত অর্থাৎ মাযহাব ও ফেরকাগুলির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হোয়েছে, ফলে জাতি ধ্বংস হোয়ে গেছে।

গ) এই অতি বিশ্লেষণের অবশ্যম্ভাবী ফল আরও হোয়েছে। তার একটা হলো জীবন-বিধানের আদেশ-নিষেধগুলির গুরুত্বের ওলট-পালট হোয়ে যাওয়া- অর্থাৎ কোন্‌টা অতি প্রয়োজনীয়, কোনটা তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয়, কোনটা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, এগুলির উল্টা-পাল্টা কোরে ফেলা- যদিও সবগুলিই জীবন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় অগ্রাধিকার (Priority) কোনটা আগে কোনটা পরে। অতি বিশ্লেষণের ফলে জীবন-ব্যবস্থাগুলির যে সব অনুশাসন অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, যার উপর সমগ্র ব্যবস্থাটার জীবন-মরণ নির্ভর কোরত সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় স্থলে নামিয়ে দিয়ে অতি অপ্রয়োজনীয় নির্দেশগুলিকে মহা গুরুত্ব দিয়ে তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হোয়েছে।

ঘ) অতি বিশ্লেষণের আরও এক আত্মঘাতী ফল এই হোয়েছে ঐ জীবন-ব্যবস্থাগুলি যা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জন্য এসেছিলো তার ব্যাখ্যা দেওয়ার (Commentary) অধিকার একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ হোয়ে পড়েছে। স্বভাবতঃই। কারণ যে আদেশ নিষেধগুলি জাতির সবার জন্যই অবতীর্ণ হোয়েছে তা সবারই বোধগম্য ছিলো- কিন্তু ওগুলিকে বিশ্লেষণ, অতি-বিশ্লেষণ কোরে জন সাধারণের বোঝার বাইরে নিয়ে যাওয়া হোয়েছে- ফলে ঐ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত শ্রেণিটির মধ্যে তা আবদ্ধ হোয়ে পড়েছে

এবং পরবর্তীতে জীবন-বিধানের সব রকম ব্যাপারে তাদের মতামত হোয়ে দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত। **এই হলো পুরোহিত শ্রেণি এবং এমনি কোরেই প্রতি জীবন-বিধান, প্রতি ধর্মে এরা নিজেরা নিজেদের সৃষ্টি কোরেছেন এবং জীবন-বিধানের মূল লক্ষ্যই বিনষ্ট কোরে ফেলেছেন।** জাতির জনসাধারণ অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে পুরোহিতদের কাছে প্রক্রিয়ার ছোটখাটো ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে বিধান (ফতোয়া) জানতে চেয়েছে আর পুরোহিতরা অতি উৎসাহে নতুন নতুন দুর্বোধ্য বিধান তৈরি কোরেছেন আর তা তাদের দিয়েছেন।

ঙ) আরেক রকমের বিকৃতি এসেছে কায়েমী স্বার্থের (Vested Interest) কারণে। প্রথমে নতুন প্রেরিতের ধর্মকে মেনে নিলেও পরে তারা দেখেছে যে তা তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হোয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন তারা ছলে-বলে, বিধান বিশ্লেষণকারীদের (মুফতি) হাত কোরে ঐ স্বার্থ বিরোধী নির্দেশগুলির পরিবর্তন কোরেছে। ক্রমশঃ সমস্ত জীবন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ভুলে যেয়ে ওর খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি পালন করাই একমাত্র কর্তব্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি জীবনব্যবস্থা ঐসবগুলি কারণের একত্রিত, সম্মিলিত প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। স্রষ্টা দিয়েছেন মানুষকে একটা প্রাণবন্ত, বেগবান (Dynamic) জীবন ধর্ম। শয়তানের প্ররোচনায় সেটাকে একটা উদ্দেশ্য-বিহীন, স্থবির, প্রাণহীন, অনুষ্ঠান সর্বস্ব ব্যাপারে পরিণত কোরেছে। ফলে আবার মানুষ অনিবার্যভাবে সেই অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর রক্তারক্তির মধ্যে পতিত হোয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ আবার তাঁর রসুল পাঠিয়েছেন মানুষকে সত্য, ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনতে।

উপরোক্ত বিকৃতিগুলি ছাড়াও আরও একটি বিশেষ কারণ হোয়েছে নতুন নবী পাঠানোর। সেটা হলো মানুষ জাতির বিবর্তন। এক নবী থেকে তাঁর পরবর্তী নবী পর্যন্ত যে সময় অতীত হোয়েছে, সেই সময়ে মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কিছুটা এগিয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিকতায় খানিকটা প্রভেদ এসেছে, নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছে। কাজেই পরবর্তী রসুল যে ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বের ব্যবস্থা থেকে কিছু ভিন্নতা থেকেছেই, যদিও মৌলিক সত্য, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব, দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম, সেরাতুল মোস্তাকীম একই থেকেছে। বিভিন্নতাগুলি শুধুমাত্র কম প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোয়, যেগুলি স্থান এবং কালের প্রভাবাধীন।

যখনই কোন নতুন নবী, প্রেরিত এসেছেন তিনি তাঁর জাতিকে যা বোলেছেন তার সারমর্ম, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কিছু এদিক ওদিক ছাড়া এই যে:

ক) আমার পূর্ববর্তী আল্লাহর রসুল তোমাদের যে দীন, জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তোমরা সেটাকে নানাভাবে অর্থহীন, অকেজো কোরে দিয়েছো। তোমরা আল্লাহর বইয়ে হাত ঘুরিয়েছো, তোমাদের ইচ্ছামত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার অর্থ বিকৃত কোরেছো। গুরুত্ব বদলিয়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি কোরেছো। এমন কি একমাত্র প্রভুর সার্বভৌমত্ব নষ্ট কোরে বহুত্ববাদে নিমজ্জিত হোয়েছো। পরম করুণাময় তাই আমায় পাঠিয়েছেন তোমাদের এই বোলতে যে-

খ) তোমরা যাকে অনুসরণ কর বোলে দাবি কর, তিনিও তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বইকে আমি স্বীকার কোরেছি (সুরা আলে ইমরান ৩, সুরা আল আনাম ৯২, ৯৩)।

গ) কিন্তু তোমরা ওটা এত বিকৃত কোরে ফেলেছো যে তা এখন বাতিল ঘোষণা কোরছি।

ঘ) এখন থেকে আমি যে বই এবং জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছি সেইটা কার্যকরী হবে।

ঙ) আমি যে সত্যই স্রষ্টার প্রেরিত তা তোমাদের কাছে প্রমাণ করার জন্য আমাকে কতকগুলি চিহ্ন, আয়াত, মো'জেজা দেয়া হোয়েছে, সেগুলো তোমরা দেখে নাও এবং

চ) আমাকে প্রেরিত, রসুল বোলে স্বীকার কোরে নাও এবং পূর্বের বিকৃত ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আমার মাধ্যমে প্রেরিত স্রষ্টার দেয়া এই নতুন জীবন-বিধান গ্রহণ কর।

তার এর ঘোষণার ফল কি হোয়েছে? বিভিন্ন প্রেরিতের জীবনীতে আমরা বিভিন্ন ফল দেখি। কোন রসুলের ডাকে কিছু লোক তাঁকে বিশ্বাস কোরে তাঁর ধর্ম গ্রহণ কোরেছে, আর কিছু লোক তাঁকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার কোরে আগের সেই অচল ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধোরে রেখেছে। কোন নবীর ডাকে অল্প কয়েকজন সাড়া দিয়েছে, বাকিরা আগের বাতিল অনুষ্ঠানগুলিকেই চালু রেখেছে। কোন কোন নবীকে পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীরা হত্যা পর্যন্ত কোরে ফেলেছে (আলে ইমরান ১৮১, ১৮৩)। আবার এমনও হোয়েছে যে কোন নবীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হোয়েছে এবং হত্যা করা হোয়েছে, কিন্তু তাঁর ওফাতের পর বহু মানুষ তাঁকে স্বীকার ও বিশ্বাস কোরে তাঁর আনা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত কোরেছে।

প্রতি নবীর সময় অধিকাংশ মানুষ তাদের হৃদয়ের ভেতরে বুঝতে পেরেছে যে এই লোক সত্যই স্রষ্টার প্রেরিত-রসুল। কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বে, চারিত্রিক শক্তিতে প্রবল অসাধারণত্ব তো ছিলোই, তার উপর চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে ছিলো অলৌকিক কাজ কোরে দেখাবার ক্ষমতা, আয়াত, মো'জেজা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদল লোক তাঁকে স্বীকার কোরে নতুন এসলামকে গ্রহণ কোরেছে, আরেক দল করে নি।

বিচার কোরলে আমরা দেখতে পাই- যারা স্বীকার কোরেছে তাদের কারণ:

ক) পূর্ববর্তী বিকৃত এসলামে থেকেও যারা তাদের আত্মাকে এবলিসের প্রভাব থেকে ব্যক্তিগতভাবে কমবেশি মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন এবং যার ফলে দীনের অবনতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য কোরছিলেন, কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিলো না।

খ) সাধারণ লোক, যারা বিকৃত ব্যবস্থায় নির্যাতিত হোয়েও অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিলো,

গ) রসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে নতুন এসলাম গ্রহণ কোরলে যে নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী তাকে যারা ভয় করে নি।

আর যারা অস্বীকার কোরেছে তাদের কারণ: ক) পূর্ববর্তী এসলামের পুরোহিত শ্রেণি, যারা সেই দীনের ধারক, বাহক বোলে নিজেদের মনে কোরতেন। এই শ্রেণির মনে চিরদিন তাদের জ্ঞানের অহংকার বিদ্যমান ছিলো। স্বভাবতঃই-কারণ তারা সমাজের, জাতির দেয়া চাঁদা, দান ইত্যাদির উপরই বেঁচে থাকতেন এবং নিরলসভাবে ধর্মের বিধান, নিয়ম, ইত্যাদির বিশ্লেষণ, অতি-বিশ্লেষণ কোরতেন এবং

জনসাধারণকে বিধান (ফতোয়া) দিতেন। কঠোর পরিশ্রম কোরে নতুন বিধান সৃষ্টি কোরতেন যাতে অন্যান্য পুরোহিতদের চেয়ে তার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়। এই পুরোহিত শ্রেণির মধ্যে বিধান-ব্যবস্থা ইত্যাদি (ফতোয়া) নিয়ে তিক্ত মতভেদ থাকলেও নতুন নবীর ব্যপারে তারা ছিলেন একত্র। কারণ নতুন এসলামকে মেনে নিলে ঐ মহা সম্মানিত স্থান থেকে তাদের পতন হবে এ কথা সবার চেতন, অবচেতন উভয় মনই জানতো। যে জ্ঞানের অহংকারের জন্য তাদের মধ্যে অবিশ্রান্ত তর্কাতর্কি, বাহাস লেগে থাকতো, সেই অহঙ্কারই তাদের শ্রেণিকে নতুন নবীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ কোরতো। প্রত্যেক নবী সব চেয়ে প্রচণ্ড বাধা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হোয়েছেন এই শ্রেণিটির কাছ থেকে। খ) যারা পুরোহিত শ্রেণিভুক্ত না হোয়েও অতি নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন কোরতেন, ঐ পুরোহিত শ্রেণির সৃষ্ট বিভিন্ন দল বা ফেরকার কোনটি চুলচেরাভাবে পালন কোরতেন।

গ) আর অস্বীকার কোরেছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা ঐ পুরোহিত শ্রেণির আদেশ-নিষেধ মানতে এমন অভ্যস্ত হোয়ে গিয়েছিলো যে ঐ পুরোহিতদের ছাড়া অন্য কারো কথা শোনার সময় ও ইচ্ছা তাদের ছিলো না। এদের মধ্যে অনেকে যদিও বুঝতে পেরেছে যে- এই মানুষটি সত্য নবী, কিন্তু তবুও তাকে স্বীকার ও গ্রহণ কোরলে সমাজে যারা পুরোনো ব্যবস্থা আঁকড়ে আছে তাদের বিদ্রুপ, নির্যাতন, এমন কি নিজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির ভয়ে তারা প্রকাশ্যে নবীকে অস্বীকার কোরেছে।

ঘ) আরো এক ধরনের মানুষ রসুলদের স্বীকার ও গ্রহণ করে নি। এরা হলো তারা যারা প্রথম দিকে বিরোধিতা কোরেছে সত্যই তাকে মিথ্যা মনে কোরে। কিন্তু পরে যখন তার চরিত্র, চিহ্ন-নিদর্শন, অলৌকিক কাজ দেখে বুঝতে পেরেছে যে, আমি তো ভুল কোরেছি- তখন কিন্তু তার প্রবৃত্তি, নফস, রিপু যাই বলুন, তাকে বাধা দিয়েছেন। বোলেছে- তুমি যাকে এতদিন ভণ্ড, মিথ্যাবাদী বোলে লোকজনকে তাকে স্বীকার করা থেকে বাধা দিয়েছো! আজ তার কাছে নত হোলে লোকে হাসবে না? এই যে আপাত দৃষ্টিতে নিজেকে ছোট করা (Loss of face), এ কোরতে না পেরে বহু লোক সত্য জেনেও রসুলের বিরোধিতা কোরেছে- রসুলকে ও তাঁর আনা নতুন এসলামকে স্বীকার করে নি।

যদিও সত্য নবীকে স্বীকার ও গ্রহণ না করার কয়েকটি বিভিন্ন কারণ উপস্থাপন কোরলাম। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যায় আসলে সবগুলির মূল কারণ অহংকার- (Pride, Vanity)। **এই কারণেই প্রতি ধর্মে বারবার বলা হোয়েছে যে যার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার, আমিত্ব থাকবে সে মুক্তি পাবে না। মানুষের মধ্যে যে ষড়রিপুর কথা বলা হয়, তার একটা অহংকার। আশ্চর্য কি- এই ষড়রিপু, অর্থাৎ ছয়টা প্রবৃত্তির মধ্যে পাঁচটা আল্লাহর মধ্যে নেই, শুধু মানুষের মধ্যে আছে। আর ষষ্ঠটা অর্থাৎ অহঙ্কার স্বয়ং আল্লাহর মধ্যে আছে এবং এটা শুধু তারই সাজে, মানুষের নয়।** তাই অহংকারের শাস্তি অতি দ্রুত এবং এ জীবনেই। আমার মনে হয় দিনের আলোর মত প্রোজ্জ্বল সত্যকেও অস্বীকার করাবার জন্য অহংকারের মত শক্তিশালী শয়তানী শক্তি আর নেই।

যুগ যুগ ধোরে একটার পর একটা দীন নিয়ে নবীরা কেন অবতীর্ণ হোয়েছেন তা আমরা আলোচনা কোরলাম। কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন মনে হোলেও আসলে সবগুলিই সেই এসলাম, দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ, সরল, অতি সহজে বোধগম্য, চিরন্তন জীবন-ব্যবস্থা, যা গ্রহণ এবং সমষ্টি ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরলে অবশ্যম্ভাবী ফল মানুষের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা, যা আল্লাহ আমাদের জন্য চান।

ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রের বিধানই মানুষকে শান্তি দিয়েছে

বর্তমানে এসলাম সম্বন্ধে দু'টি ভুল ধারণা প্রচলিত। একটি হলো মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটি যে ধর্মে বিশ্বাস করে এটিকে বলা হয় এসলাম এবং অন্যান্য ধর্মকে অন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হোয়েছে। কিন্তু আসলে আল্লাহ আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষ নবী (দ:) পর্যন্ত যতবার যতভাবে জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন সবগুলোই ঐ একই নাম এসলাম, শান্তি অর্থাৎ যে জীবন-বিধান অনুসরণ কোরে চোললে মানুষ শান্তিতে সুখে বাস কোরতে পারবে আর অস্বীকার কোরলে তার অবধারিত পরিণতি অশান্তি, রক্তারক্তি, অবিচার। রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক অবিচার- যা মালায়েকরা বোলেছিলেন।

দ্বিতীয়টি হলো এই ধারণা (আকীদা) যে, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম এসলাম। এটাও ভুল। কারণ আল্লাহ ইচ্ছা কোরলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাঁকে বিশ্বাস কোরবে। কোন অবিশ্বাসী, কোন সন্দেহকারী, কোন মোশরেক বা মোনাফেক থাকবে না (সুরা আল আনা'ম ৩৫, সুরা ইউনুস ১০০)। কাজেই তা নয়। আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন অর্থ মানুষের মধ্যে যুক্তির শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সর্বোপরি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, দিয়ে নবী পাঠিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে পথে চোললে সে নিজেদের মধ্যে মারামারি, রক্তারক্তি না কোরে শান্তিতে থাকে। এরপর তিনি দেখবেন কে বা কারা তাঁর দেখানো পথে চোলবে আর কে বা কারা তা চোলবে না।

কাজেই আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম এসলাম নয়। তাঁর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করার ফল হিসাবে যে শান্তি সেই শান্তির নাম এসলাম। মানুষ যদি যেসব নিয়ম, আইনের মধ্যে এই জগত সৃষ্টি করা হোয়েছে ও চোলছে তা সব জানতো তবে হয়তো মানুষই নিজেদের জন্য এমন জীবন-ব্যবস্থা, ধর্ম তৈরি কোরে নিতে পারতো যা মেনে চোললেও ঐ শান্তি এসলাম আসতে পারতো। কিন্তু মানুষ তা জানে না- তাকে আল্লাহ অতখানি জ্ঞান দেন নি। তাই স্রষ্টা তাকে বোলে দিয়েছেন কোন পথে চোললে, কেমন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ কোরলে ঐ অভীষ্ট শান্তি, এসলাম আসবে। বোলে দিয়েছেন তাঁর নবীদের মাধ্যমে। মনুর (আ:), কৃষ্ণের (আ:), যুধিষ্ঠিরের (আ:), এব্রাহীমের (আ:), মুসার (আ:), ঈসার (আ:) এবং আরও অনেক অনেক নবীদের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে মোহাম্মদের (দ:) মাধ্যমে। [মনু (নুহ্ আঃ) কৃষ্ণ (আ:), যুধিষ্ঠির (ইদরীস আঃ) এরা যে নবী ছিলেন তা আমার গবেষণার ফল, ব্যক্তিগত অভিমত। এ অভিমত আমি অন্য কাউকে গ্রহণ কোরতে জোর কোরছি না]। কোন প্রাণী হত্যা কোরব

না, কেউ আমার কোট চুরি কোরলে তাকে জোব্বাটাও দিয়ে দিবো, এ অর্থে এ এসলাম নয়। যে ধর্ম ঐ শিক্ষা প্রচার করে তারা সংখ্যায় পৃথিবীতে অন্য সব ধর্মের চেয়ে বেশি কিন্তু সমস্ত পৃথিবী আজ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি অশান্তি আর রক্তারক্তিতে লিপ্ত। শুধু তাই নয় ঐ মতে বিশ্বাসীরা এই শতাব্দীতেই দু'বার নিজেদের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে প্রায় পনের কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে, হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টি কয়েক লক্ষ মানুষসহ ধ্বংস কোরেছে এবং আজ পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতিটাকেই ধ্বংস করার মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

মানুষকে নিজেদের মধ্যে অশান্তি, অবিচার, মারামারি না কোরে শান্তিতে, এসলামে থাকার জন্য জীবনবিধান দিয়ে আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি স্থানে, প্রতি জনপদে, প্রতি জাতিতে তার প্রেরিতদের, নবীদের পাঠিয়েছেন (সুরা আন নহল ৩৬)। মানুষ জাতির কিছু অংশ তা গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা কোরেছে, কিছু অংশ করে নি। যারা গ্রহণ কোরেছে তাদের সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি জীবনের সমস্ত কিছুই ঐ ব্যবস্থার নির্দেশে পরিচালিত হোয়েছে। তাদের সমাজের আইনের উৎস শুধু ঐ জীবন-বিধান বা ধর্মই ছিলো না ঐ বিধানই আইন ছিলো, ওর বাহিরের কোন আইন সমাজ গ্রহণ কোরত না। অনেক কারণে (বিকৃতির কারণগুলো পেছনে বোলে এসেছি) আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান বদলিয়ে ফেলে বা ইচ্ছামত তার ভুল ব্যাখ্যা কোরে তা চালানো হোয়েছে। কিন্তু ঐ ভুল ও অন্যায় আইনকেও সেই ধর্ম বা দীনের আইন বোলেই চালানো হোয়েছে। তার বাহিরের, মানুষের তৈরি বোলে চালানো যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসকে না তলিয়ে, শুধু এক নজরে যারা পড়েছেন তারাও এ কথা অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে মানব সমাজ চিরদিন শাসিত হোয়ে এসেছে ধর্মের আইন দিয়ে। যখন যেখানে যে নবী ধর্ম বা জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা কোরেছেন, সেখানে রাজা বা শাসনকর্তা শাসন কোরেছেন সেই আইন দিয়ে- অন্য কোন কিছু দিয়ে নয়। আইনের নির্দেশ, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কোরেছেন সমাজের বিজ্ঞেরা, পুরোহিতরা, আর তাকে প্রয়োগ কোরেছেন রাজারা, শাসকরা। ওর বাইরের কোন আইন, আদেশ চালাবার চেষ্টা কোরলে সমাজ তা গ্রহণ কোরত না, প্রয়োজনে বিদ্রোহ কোরত। উদাহরণ হিসাবে পশ্চিম এশিয়া নিন। ইহুদিদের আগে ওখানে আমন বা রা দেবতা থেকে শুরু কোরে অনেক রকম দেব-দেবীর ধর্মের আইন চোলতো। ওগুলোও পূর্বতন কোন নবীর আনা দীনের বিকৃতির ফল ছিলো। এব্রাহীম (আ:) আবার আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার পর ইহুদিরা যতদিন মধ্য এশিয়ায় ছিলো ততদিন ঐ আল্লাহ প্রেরিত দীনই ছিল তাদের জাতির আইন। ভারতের কথা ধরুন। রামায়ন, মহাভারতসহ ইতিহাস পড়ুন। দেখবেন রাজারা শাসন কোরেছেন শাস্ত্রানুযায়ী- অর্থাৎ ওটাই ছিলো শাসনতন্ত্র (Constitution)। ঐশ্বরিক বইয়ের (Scripture) **উপর ভিত্তি কোরে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রের বিধান দিতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এবং বিধান বা আইন জনগণের উপর প্রয়োগ ও তার রক্ষার দায়িত্ব ছিলো ক্ষত্রিয় রাজাদের উপর। এই শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে কোন আদেশ, নির্দেশ দেয়া রাজা বা শাসকের সাধ্য ছিলো না। ইউরোপের অবস্থাও তাই ছিলো। পোপের নির্দেশে রাজ্য শাসন কোরতেন রাজারা। কোন রাজা পোপের নির্দেশ অমান্য কোরতে পারতেন না- কোরলে তার দুরবস্থার সীমা থাকতো না।** মোট কথা পৃথিবীর কোথাও আইনের উৎস ধর্ম ছাড়া আর কোন কিছুকে গ্রহণ করা হয় নি।

এ পর্যন্ত যা বোলে এলাম, তা সমস্তটা একত্র কোরলে আমরা একটা পরিষ্কার ছবি পাই। সেটা হলো- গোটা পৃথিবীটাকে পটভূমি হিসাবে নিয়ে মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে যদি আরম্ভ করি তবে দেখতে পাই যে প্রথম মানব আদম (আ:) আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান, দীন এসলাম অনুযায়ী চোলতে লাগলেন তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে এবং ফলে শান্তিতে বাস কোরতে থাকলেন। এবলিস তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী চেষ্টা চালাতে লাগলো সেই জীবনব্যবস্থা থেকে মানুষকে বিচ্যুত কোরতে। মানুষেরই ভেতরে বোসে তাকে প্ররোচনা দিয়ে আইন ভঙ্গ করাতে। কাবিলকে দিয়ে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করালো। তারপর আরো আইন ভাঙ্গার ফলে যখন ওটা যথেষ্ট বিকৃত হোয়ে গেলো তখন আল্লাহ পাঠালেন দ্বিতীয় রসুল। তার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো অনেকে রোয়ে গেলো সেই পুরোনো ব্যবস্থায়- যেটা ছিলো আদমের (আ:) উপর দেয়া। সৃষ্টি হলো দু'টো দীন, দু'টো ধর্ম, দু'টো জীবনব্যবস্থা। এদিকে মানুষের বংশ বৃদ্ধি চোলছেই। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লো আদম সন্তানরা পৃথিবীর চারিদিকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেখানেই তারা বসতি স্থাপন করলো সেখানেই আসতে লাগলেন প্রেরিত নবীরা আল্লাহর দেয়া দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম নিয়ে। উদ্দেশ্য সেই একই- মানুষ যেন নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি না কোরে, রক্তপাত না কোরে শান্তি ও সুখে বাস কোরতে পারে। একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নবী উপস্থিত ছিলেন। কেউ হয়তো চীনের এক প্রান্তে, কেউ দক্ষিণ আমেরিকায়, কেউ ইউরোপে, কেউ মধ্য এশিয়ায়, কেউ ভারতের কোন কোণে। আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যান নি। যুগ বয়ে চলেছে, নবীরা মানুষের জন্য জীবন-ধর্ম দিয়ে চলে যাচ্ছেন, শয়তান মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে সেগুলো বিকৃত, অকেজো কোরে ফেলছে। তারা আবার আসছেন আবার নতুন কোরে জীবন পথ দিচ্ছেন, নতুন ধর্ম সৃষ্টি হোয়ে চলেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই অতীতে হারিয়ে গেছেন। তারাও হারিয়ে গেছেন, তাদের মাধ্যমে প্রেরিত জীবনব্যবস্থা গুলিও হারিয়ে গেছে। আমরা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই তাদের আনা এসলামকেও দেখতে পাই। পাই, কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে এবং মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃতভাবে।

এই হলো মানুষের প্রকৃত অতীত। ইতিহাসকে বহুলোক বহুভাবে ব্যাখ্যা কোরেছেন। কিন্তু সত্য গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, ন্যায় ও অন্যায়ের অবিরাম দ্বন্দ্ব, সমষ্টি ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আত্মাকে একদিকে এবলিস অন্যদিকে আল্লাহর আত্মা, রুহাল্লাহর টানাটানি- এই হলো আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে আজ পর্যন্ত মানুষের সত্যিকার অতীত। **এবং এ শুধু অতীত নয় ভবিষ্যতও নিঃসন্দেহে এই-ই। এর কোন বিরতি, কোন চ্যুতি হয় নি, হোচ্ছে না, হবে না।** ■

[এ বিষয়গুলি নিয়ে মাননীয় এমামুয্‌যামান তাঁর লেখা 'এ এসলাম এসলামই নয়' নামক বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা কোরেছেন। বইটি সর্ব মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো।]

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১,
০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫

ধর্মব্যবসা ও জঙ্গিবাদ নিরসনে যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে দেশেরপত্র আয়োজিত আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীবর্গ

গত ২৩ মার্চ কুমিল্লায় দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল এম.পি। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'দৈনিক দেশেরপত্র প্রকাশিত লেখা ও বক্তব্যে এসলামে নারী ও পুরুষের অধিকারের যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছে সমাজের সবাই ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হলে ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের সমুচিত জবাব দেয়া সম্ভব হবে। তারা মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে আমাদের রুখতে পারবে না। এজন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে।'

গত ৫ এপ্রিল গাজীপুরে দৈনিক দেশেরপত্রের ব্যুরো অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এম.পি। তিনি বলেন, "দৈনিক দেশেরপত্র মানুষের কল্যাণের জন্য, একটি শান্তিময় সমাজ মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য কাজ করছে। যদি তাদের এই লক্ষ্য ও আদর্শে অটল থাকে তাহলে আমরা সর্বাবস্থায় তাদের পাশে থাকবো।"

গত ৯ মার্চ, দৈনিক দেশেরপত্রের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক। তিনি বলেন, 'দেশেরপত্রের এই জঙ্গিবাদ ও ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতির বিষয়বস্তুর সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোটি কোটি সমর্থক একমত এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ জনতা একে সর্বাত্মক সাহায্য করবে।' তিনি এ ব্যাপারে দেশেরপত্রকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ধর্মব্যবসা ও জঙ্গিবাদ নিরসনে যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে দেশেরপত্র আয়োজিত আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীবর্গ

পাবনায় দৈনিক দেশেরপত্রের জেলা ব্যুরো কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু। তিনি বলেন, "আজকে আমাদের লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে, ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা বিরোধীদের, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে, মানবতা-বিরোধীদের বিরুদ্ধে। দেশেরপত্র সেই চেতনাকে ধারণ করছে বোলে আমি দেশেরপত্রের সাথে সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্য পোষণ করছি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান পুরো বাঙালি জাতিকে একত্রিত করার মত এই মহান কাজে দেশেরপত্রই হবে আমাদের মুখপত্র।"

গত ৯ এপ্রিল দৈনিক দেশেরপত্রের খুলনা বিভাগীয় ব্যুরো অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এম.পি। তিনি জঙ্গিবাদ দমন, ধর্মের নামে অপরাজনীতি এবং ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দেশেরপত্রের চলমান কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে দেশেরপত্রের এই কার্যক্রম প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ ও আপামর জনসাধারণকে এ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গত ১১ এপ্রিল নেত্রকোনায় দেশেরপত্রের জেলা কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। তিনি বলেন- "আপনাদের কথায় আমি পুলকিত হোয়েছি, উজ্জীবিত হোয়েছি। আমার শিরা-উপশিরা, ধমনীতে জাগরণ সৃষ্টি হোয়েছে। আপনাদের সকল সেন্টিমেন্ট ও বক্তব্যের সাথে আমি একমত। আমাদের পথচলা একসাথে। আজ আমরা চিহ্নিত কোরতে পেরেছি জাতির মূল সমস্যা কোথায়। এই ধর্মব্যবসায়ী, ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতিকারীরাই জাতির মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হোয়েছে আজ, যা আমরা গত ৪৩ বছরেও বুঝতে পারি নি। আমরা সম্মিলিতভাবে এই সমস্যাকে মোকাবেলা কোরতে চাই।"

যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হোল

আদম (আ.) থেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্য নবী রসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের জাতির কাছে যে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তা হোল তওহীদ অর্থাৎ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কোন কথা আছে, আদেশ নিষেধ আছে সেখানে আর কারোটা না মানা। নবী রসুলদের মাধ্যমে আসা এই তওহীদের দাবি যখন যে জাতি মেনে নিয়েছে তখন তারা পুরস্কারস্বরূপ, ফলস্বরূপ শান্তিপূর্ণ ভারসাম্যযুক্ত সমাজ পেয়েছে। সে সমাজে দেহ-আত্মার সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ কোরতো। এই নবী রসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা:) এর আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আ:)। তাঁকে পাঠানো হোয়েছিল শুধুমাত্র মুসা (আ:) এর অনুসারী ইহুদি জাতির কাছে। তিনি এসেছিলেন মুসা (আ:) এর আনীত দীনকে সত্যায়ন কোরে শুধু মাত্র দীনের হারিয়ে যাওয়া আত্মিক ভাগটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দীনের ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্য। তিনি কখনই খ্রিস্ট ধর্ম নামে নতুন কোন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কোরতে চান নি। ঈসা (আ:) যদি ইহুদিদের বাইরে তার দেখানো পথ অনুসরণ বা গ্রহণ কোরতে বোলতেন তা হোলে তা হোত চরম সীমালংঘন ও অনধিকার চর্চা। একজন ইহুদির শুধুমাত্র রোগ সারিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হোলেও তিনি ইতস্তত কোরেছিলেন। তিনি তাঁর সীমারেখার প্রতি ইঙ্গিত কোরে বোলেছিলেন, "I was sent only to the lost sheep of Israel. (Matthew 15:24) অর্থাৎ আমি শুধুমাত্র বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষ গুলিকে পথ দেখাতে এসেছি। তিনি যখন তাঁর প্রধান ১২ জন শিষ্যকে প্রচার কাজে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাদের উপদেশ দিলেন, "Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel." (Matthew 10:5-6) অর্থাৎ "তোমরা অন্য জাতিগুলির কাছে যেও না এবং সামারিয়ান শহরে, নগরে প্রবেশ কোরো না। শুধুমাত্র এসরাইলি পথভ্রষ্ট মেষগুলির কাছে যেতে থাকবে।"

এভাবে ঈসা (আ:) যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু কোরলেন তখন সেই চিরাচরিত ব্যাপারের পুনরানুষ্ঠান আরম্ভ হোয়ে গেল অর্থাৎ পূর্ববর্তী দীনের, মুসা (আ:) এর আনীত দীনের ভারসাম্যহীন বিকৃত রূপের যার ধারক বাহক ছিলেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই পুরোনো কারণ আত্মম্ভরিকতা! কী? আমরা সারাজীবন ধরে বাইবেল চর্চা কোরলাম, এর প্রতি শব্দ নিয়ে গবেষণা কোরে কত রকমের ফতোয়া আবিষ্কার কোরলাম, এসব কোরে আমরা রাব্বাই, সাদ্দুসাই হোয়েছি। আর এ কি না আমাদের ধর্ম শেখাতে এসেছে! ঈসা (আ:) তাদেরকে বড় বড় মো'জেজাগুলো দেখানোর পরও তারা কেউই তাঁকে স্বীকার কোরল না। শুধুমাত্র সমাজের নিম্নশ্রেণির হাতে গোনা কিছু ইহুদি তাঁর প্রতি ঈমান আনলো।

দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্টায় মাত্র ৭২ জন মতান্তরে ১২০ জন ইহুদি তাঁর উপর ঈমান আনলো ও তাঁর দেখানো পথে চোলতে শুরু কোরল। কিন্তু বিকৃত দীনের ধারক বাহক রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা তাদের তখনকার প্রভু রোমানদের কে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হোল যে, ভবিষ্যতে ঈসা (আ:) রোমানদের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হবে। ফলে এই পুরোহিতরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসা (আ:) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা কোরল। তখন আল্লাহ তাকে স্বশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য তাঁকে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল তার চেহারা অবিকল ঈসা (আ:) এর মত কোরে দিলেন। ফলে তারা তাকে ঈসা (আ:) মনে কোরে হত্যা কোরল। এই ঘটনার পর ঈসার (আ:) যে ৭২ জন অনুসারী ছিলো তারা প্রাণভয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেল। গোপনে ব্যক্তিগতভাবে ঈসা (আ:) এর পথে চলা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রোইলো না।

কিছুদিন পর পল নামের একজন লোক ঈসা (আ:) এর উপর বিশ্বাস আনলো। তবে তার পরবর্তী কাজগুলো বিবেচনা কোরলে বোঝা যায় যে, ঈসা (আ:) এর অনুসারীদের মাঝে ঢুকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। ঈসা (আ:) তাঁর অনুসারীদেরকে বারবার যে কাজে সাবধান কোরে দিয়েছিলেন অর্থাৎ অ-ইহুদিদের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা যাবে না। কিন্তু পল তাঁর অনুসারীদেরকে এই শিক্ষা ইহুদিদের বাইরে প্রচার করার জন্য প্রস্তাব দিলো। প্রথমত ঈসা (আ:) এর শিষ্যরা তার এই প্রস্তাবে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ এটা সরাসরি তাদের শিক্ষকের শিক্ষার বিপরীত। কিন্তু পল তাদের মত বদলাতে সমর্থ হোলেন সম্ভবত এই যুক্তিতে যে, বনি ইসরাইলিদের মধ্যে ঈসা (আ:) এর শিক্ষা প্রচার অসম্ভব যেখানে ঈসা (আ:) নিজে ব্যর্থ হোয়ে গিয়েছেন সেখানে শিষ্যরা যে হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাই ঈসা (আ:) এর এই শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তারা তাঁদের শিক্ষকের সাবধানবাণীকে প্রত্যাখ্যান কোরে এই শিক্ষাকে বাইরে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। পল কিন্তু ঈসা (আ:) এর কাছে থেকে সরাসরি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ কোরতে পারেনি, তাই তাঁর শিক্ষার আসল মর্মবাণী সে পায় নি। কিন্তু যখন ঈসা (আ:) এর শিক্ষাকে বাইরে প্রচার করা শুরু হোল তখন পল হোয়ে গেলেন ঐ ধর্মের অন্যতম একজন প্রবক্তা। কাজেই তিনি যে শিক্ষা প্রচার কোরেছিলেন তা যে শুধু ঈসা (আ:) এর ধর্মের থেকে বহু দূরে তাই নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। এই প্রচারের ফলে অ-ইহুদিদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ এই শিক্ষা গ্রহণ কোরে পলের উপদেশ মতো তাদের জীবন পরিচালনা কোরতে লাগলো। পল তার ইচ্ছামত এই শিক্ষাকে যোগ-বিয়োগ কোরে নতুন এক ধর্মের সৃষ্টি কোরল। যা মুসা (আ:) এর ধর্মও নয়, ঈসা (আ:) এর আনীত আত্মিক ভাগও নয়, পলের হাতে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্মই সৃষ্টি হোয়ে গেল যাকে খ্রিস্ট ধর্ম না বোলে পলীয় ধর্ম বোললেও ভুল হবে না। এই খ্রিস্টধর্মরূপী, কার্যতঃ পলীয় ধর্মটি ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে গৃহীত হোয়ে গেল। তবে আসল ব্যাপারটা ঘোটলো এখনই। যুগে যুগে মানুষ তদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা কোরে এসেছে ধর্মের বিধান দিয়ে। ধর্মের বিকৃত পুরোহিতদের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ ধর্মের আসল রূপ বিকৃত হোয়ে গেলেও কিন্তু ঐ বিকৃত

রূপকেই ধর্মের বিধান বোলেই চালাতে হোয়েছে। রাষ্ট্র সর্বদাই চোলেছে ধর্মীয় বিধি-বিধান, আইন কানুন দ্বারা। স্বভাবতই খ্রিস্টধর্মকে যখন সমস্ত ইউরোপ একযোগে গ্রহণ কোরে নিল তখন তারাও চেষ্টা কোরল খ্রিস্টধর্মকে দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে তো কোন আইন-কানুন, দণ্ডবিধি নেই এটা ইহুদি ধর্মের হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে পুনঃস্থাপনের এক প্রক্রিয়ামাত্র। জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু দরকার তা ইহুদিদের কাছে অবিকৃত ছিল। কিন্তু ইহুদি ধর্ম থেকে ঈসা (আ:) এর আনীত আত্মিক ভাগকে পৃথক কোরে ফেলায় খ্রিস্টধর্ম সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা কোরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোল। তবুও ঐ চেষ্টা করা হোল এবং কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেলো যে, এ অচল, অসম্ভব। প্রতিপদে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অঙ্গনে সংঘাত আরম্ভ হোল। এই সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে শুধু এটুকু বোললেই চোলবে যে, এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে ইউরোপীয় নেতা, রাজাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা রোইল। হয় এই জীবনব্যবস্থা বা ধর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরতে হবে। আর নইলে তাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে। তৃতীয় আর কোন রাস্তা রোইল না। যেহেতু সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়, কাজেই তারা দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিলো। অষ্টম হেনরীর সময় ইংল্যাণ্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খ্রিস্টান জগত এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ কোরতে বাধ্য হোল। এরপর থেকে খ্রিস্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি এক কথায় জাতীয় জীবনে স্রষ্টার আর কোন কর্তৃত্ব রোইল না। জন্ম হোল ধর্মনিরেপেক্ষতার।

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হোলেও মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই প্রথম মানুষ তাদের জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন থেকেও ধর্মের প্রভাব আস্তে আস্তে লুপ্ত হোয়ে যেতে শুরু কোরল। স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধানে যে দেহ ও আত্মার ভারসাম্য ছিলো তার অভাবে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানুষ সৃষ্টি হোতে লাগলো তাদের শুধু একটি দিকেরই পরিচয় লাভ হোল- দেহের দিক, জড়, স্থুল দিক, স্বার্থের দিক, ভোগের দিক। জীবনের অন্য দিকটার সাথে তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হোয়ে গেছে। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার পরিণাম এই হোয়েছে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। এখন আবার মানুষকে মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে হোলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করাই এখন একমাত্র সমাধান। ■

প্রচেষ্টা ও সংগ্রামহীন প্রার্থনা (দোয়া) স্রষ্টা কবুল করেন না

বর্তমানে কথিত ধার্মিক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ কাজ হোচ্ছে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করা, দোয়া করা। এর ধর্মীয় নেতারা, আলেম, মাশায়েখ, পুরোহিতরা এই দোয়া চাওয়াকে বর্তমানে একটি আর্টে, শিল্পে পরিণত কোরে ফেলেছেন। লম্বা ফর্দ ধোরে লম্বা সময় নিয়ে স্রষ্টার কাছে এরা দোয়া কোরতে থাকেন। যেন এদের দোয়া মোতাবেক কাজ করার জন্য স্রষ্টা অপেক্ষা কোরে বোসে আছেন। এসলাম ধর্মের আলেম সাহেবরা মাঝে মাঝে বিশেষ (Special) প্রার্থনা বা মোনাজাতেরও ডাক দেন এবং তাতে এত লম্বা সময় ধোরে মোনাজাত করা হয় যে হাত তুলে রাখতে রাখতে মানুষের হাত ব্যথা হোয়ে যায়। অজ্ঞানতা ও বিকৃত আকীদার কারণে সকল ধর্মের অনুসারীরাই ভুলে গেছেন যে কোন জিনিসের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না কোরে শুধু তাঁর কাছে চাইলেই তিনি তা দেন না, ওরকম প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌছে না। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নবীকে (দ:), যাঁকে তিনি প্রিয়তম বন্ধু বোলে ডেকেছেন তাঁকে যে কাজের ভার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সে কাজ সম্পন্ন কোরতে তাঁকে কি অপরিসীম পরিশ্রম কোরতে হোয়েছে, কত অপমান-বিদ্রূপ-নির্যাতন-পীড়ন সহ্য কোরতে হোয়েছে- যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে- আহত হোতে হোয়েছে। তিনি ওসব না কোরে বোসে বোসে আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মতো আল্লাহর কাছে দোয়া কোরলেই তো পারতেন। আল্লাহর কাছে বিশ্বনবীর (দ:) দোয়া বড়, না আমাদের আলেম মাশায়েখ, পুরোহিতদের দোয়া বড়? দোয়াতেই যদি কাজ হোত তবে আল্লাহর কাছে যাঁর দোয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কারো দোয়া নেই- সেই রসুল (দ:) ঐ অক্লান্ত প্রচেষ্টা (জেহাদ) না কোরে সারাজীবন ধরে শুধু দোয়াই কোরে গেলেন না কেন? তিনি তা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে প্রচেষ্টা (সর্বাত্মক সংগ্রাম) ছাড়া দোয়ার কোন দাম আল্লাহর কাছে নেই। তাঁর আগেও বহু নবী-রসুল গত হোয়েছেন যাঁদের সকলকেই সংগ্রাম কোরতে হোয়েছে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সঙ্কটের প্রবলতায় কম্পমান হোতে হোয়েছে। মুসাকে (আ:) আমালেকা, মাদায়েন প্রভৃতি জনপদবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে, ঈসাকে (আ:) সম্মুখীন হোতে হোয়েছে ধর্মব্যবসায়ী ও শাসকশ্রেণির নির্যাতনের। কৃষ্ণ (আ:) কে যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে আপন মামার বিরুদ্ধে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের (আ:) পক্ষের প্রায় সকল সৈন্যের বিনাশ ঘোটেছিল। পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ (আ:) জীবন বাজি রেখে এই যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অধর্মকে বিনাশ করার প্রয়াস করেছেন এবং সফল হয়েছেন, তাঁরা প্রচেষ্টা না কোরে প্রার্থনা করেন নি। প্রচেষ্টাহীন দোয়া দিয়ে যদি কাজ হোত তাহোলে ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এই যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটানোর কী প্রয়োজন ছিল?

তবে সেই নবী রসুলগণ যে দোয়া করেন নি তা নয়, শেষ নবীও দোয়া কোরেছেন কিন্তু যথা সময়ে কোরেছেন অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর, সর্বরকম কোরবানির পর, জান বাজি রাখার পর যখন আমলের আর কিছু বাকি নেই তখন। বদরের যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন মোজাহেদ আসহাব তাদের প্রাণ আল্লাহ ও রসুলের তরে কোরবানি করার জন্য তৈরি হোয়ে সারিবদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছেন, যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে, শুধু সেই সময় আল্লাহর হাবিব আল্লাহর কাছে দোয়া কোরলেন তাঁর প্রভুর সাহায্য চেয়ে। ঐ দোয়ার পেছনে কি ছিলো? ঐ দোয়ার পেছনে ছিলো আল্লাহর নবীর (দ:) চৌদ্দ বছরের অক্লান্ত সাধনা, সীমাহীন কোরবানি, মাতৃভূমি ত্যাগ কোরে দেশত্যাগী হোয়ে যাওয়া, পবিত্র দেহের রক্তপাত ও আরও বহু কিছু এবং শুধু তাঁর একার নয়। ঐ যে তিনশ' তের জন ওখানে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য নামাজের মতো সারিবদ্ধ হোয়ে দাঁড়ানো ছিলেন তাদেরও প্রত্যেকের পেছনে ছিলো তাঁদের আদর্শকে, দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, দ্বিধাহীন কোরবানি, নির্মম নির্যাতন সহ্য করা। প্রচেষ্টার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেষ সম্বল প্রাণটুকু দেবার জন্য তৈরি হোয়ে ঐ দোয়া কোরেছিলেন মহানবী (দ:)। ঐ রকম দোয়া আল্লাহ শোনেন, কবুল করেন, যেমন কোরেছিলেন বদরে। কিন্তু প্রচেষ্টা নেই, বিন্দুমাত্র সংগ্রাম নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত তুলে দোয়া আছে অমন দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। বদরের ঐ দোয়ার পর সকলে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অনেকে জান দিয়েছিলেন, আমাদের ধর্মীয় নেতারা দোয়ার পর পোলাও কোর্মা খেতে যান। খেয়ে আসার সময় পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে আসেন। ঐ দোয়া ও এই দোয়া আসমান জমিনের তফাৎ।

আল্লাহ বোলেছেন, "যে যতখানি চেষ্টা কোরবে তার বেশি তাকে দেয়া হবে না (কোর'আন, সুরা নজম, আয়াত-৩৯)।" মসজিদে, বিরাট বিরাট মাহফিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের এজতেমায় যে দফাওয়ারী দোয়া করা হয়, যার মধ্যে মসজিদে আকসা উদ্ধার অবশ্যই থাকে- তাতে যারা দোয়া করেন তারা দোয়া শেষে দাওয়াত খেতে যান, আর যারা আমীন আমীন বলেন তারা যার যার ব্যবসা, কাজ, চাকরি ইত্যাদিতে ফিরে যান, কারোরই আর মসজিদে আকসার কথা মনে থাকে না। অমন দোয়ায় বিপদ আছে, হাত ব্যথা করা ছাড়াও বড় বিপদ আছে, কারণ অমন দোয়ায় আল্লাহর সাথে বিদ্রূপ করা হয়। তার চেয়ে দোয়া না করা নিরাপদ। যে পড়াশোনাও করে না পরীক্ষাও দেয় না- সে যদি কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে যেয়ে ধর্ণা দেয় যে, আমার ডিগ্রি চাই, ডিগ্রী দিতে হবে। তবে সেটা প্রিন্সিপালের সঙ্গে বিদ্রূপের মতই হবে। আমাদের দোয়া শিল্পীরা, আর্টিস্টরা লক্ষ লক্ষ লোকের এজতেমা, মাহফিলে দোয়া করেন- হে আল্লাহ! তুমি বায়তুল মোকাদ্দাস ইহুদিদের হাত থেকে উদ্ধার কোরে দাও এবং এ দোয়া কোরে যাচ্ছেন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম থেকে, ঐ সময়ে যখন দোয়া করা শুরু কোরেছিলেন তখন দোয়াকারীরা আজকের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তনও এখনকার চেয়ে অনেক ছোট ছিলো। যেরুজালেম ও মসজিদে আকসা তখন ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এই মহা মোসলেমদের প্রচেষ্টাহীন, আমলহীন দোয়া যতোই বেশি লোকের সমাবেশে এবং যতোই বেশি লম্বা সময় ধরে হোতে লাগলো ইহুদিদের হাতে আরবরা ততই বেশি মার খেতে লাগলো আর ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তনও ততোই বাড়তে লাগলো। আজ শুনি কোন জায়গায় নাকি ২০/২৫ লক্ষ মোসলেম একত্র হোয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দুনিয়ার মোসলেমের ঐক্য, উন্নতি ইত্যাদির সাথে তাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের মুক্তির জন্য দোয়া করে। আর আজ ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তন প্রথম অবস্থার চেয়ে তিন গুণ বড় এবং পূর্ণ যেরুজালেম শহর বায়তুল মোকাদ্দাসসহ মসজিদে আকসা তাদের দখলে চলে গেছে এবং মোসলেম জাতির ঐক্যের আরও অবনতি হোয়েছে এবং সকল জাতির হাতে আরও অপমানজনক মার খাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় এরা এই বিরাট বিরাট মাহফিলে, এজতেমায়, মসজিদে, সম্মেলনে যা যা দোয়া কোরছেন, আল্লাহ তার ঠিক উল্টোটা কোরছেন। যত বেশি দোয়া হোচ্ছে, ততো উল্টো ফল হোচ্ছে। সবচেয়ে হাস্যকর হয় যখন এই অতি মোসলেমরা গৎ বাঁধা দোয়া কোরতে কোরতে 'ফানসুরনা আলাল কওমেল কাফেরিন'-এ আসেন। অর্থ হোচ্ছে "হে আল্লাহ! অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে (সংগ্রামে) আমাদের সাহায্য কর (সুরা বাকারা-২৮৬)।" আল্লাহর সাথে কি বিদ্রূপ। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লেশমাত্র নেই, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেই, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চোলছে তাতে যোগ দেয়া দূরের কথা, তাতে কোন সাহায্য পর্যন্ত দেয়ার চেষ্টা নেই, শুধু তাই নয় গায়রুল্লাহর, দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থা জাতীয় জীবনে গ্রহণ কোরে নিজেরা যে শেরক ও কুফরীর মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছেন, এমন কি তার বিরুদ্ধে যেখানে সংগ্রাম নেই সেখানে কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার চেয়ে হাস্যকর আর কী হোতে পারে? এ শুধু হাস্যকর নয়, আল্লাহর সাথে বিদ্রূপও। তা না হোলে দোয়ার উল্টো ফল হোচ্ছে কেন? যারা দোয়া করাকে আর্টে পরিণত কোরে, কর্মহীন, প্রচেষ্টাহীন, আমলহীন, কোরবানিহীন, সংগ্রামহীন দোয়া কোরছেন তারা তাদের অজ্ঞতায় বুঝছেন না যে তারা তাদের ঐ দোয়ায় আল্লাহর ক্রোধ উদ্দীপ্ত কোরছেন, আর তাই দোয়ার ফল হোচ্ছে উল্টো। তাই বোলছি ঐ দোয়া করার চেয়ে দোয়া না করা নিরাপদ।

মহাভারতে একটি কথা আছে, "গৃহে যখন আগুন লাগে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে তখন পুণ্যলাভ হয় না"। অর্থাৎ গৃহে আগুন লাগলে প্রথম কর্তব্য সেই আগুন নিভিয়ে গৃহের সকলকে রক্ষা করা। আর সেই আগুন নিভানোর জন্য প্রার্থনা নয় প্রচেষ্টাই আগে প্রয়োজন, এর পর প্রার্থনা। আপনি যদি প্রচেষ্টা ত্যাগ কোরে শুধু প্রার্থনা করতে থাকেন তবে আগুনে পুড়ে গৃহের সকলেই মারা যেতে পারে এবং এর জন্য দায়ী থাকবেন আপনিই।

দাজ্জালের বিধান মেনে নেওয়ার ফলে সমগ্র মানবজাতি যখন অন্যায়, অবিচার, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত, হত্যা, ধর্ষণ তথা চরম অধর্মে লিপ্ত তখন আমাদের প্রধান কর্তব্যই হলো মানবজাতিকে এই চরম অশান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করা, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। প্রচেষ্টা না কোরে শুধু প্রার্থনা করলে এই কাজে সফলতা আসবে না। এ যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান The Leader of The Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারী তথা হেযবুত তওহীদের সদস্যগণ সেই প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। ■

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭,

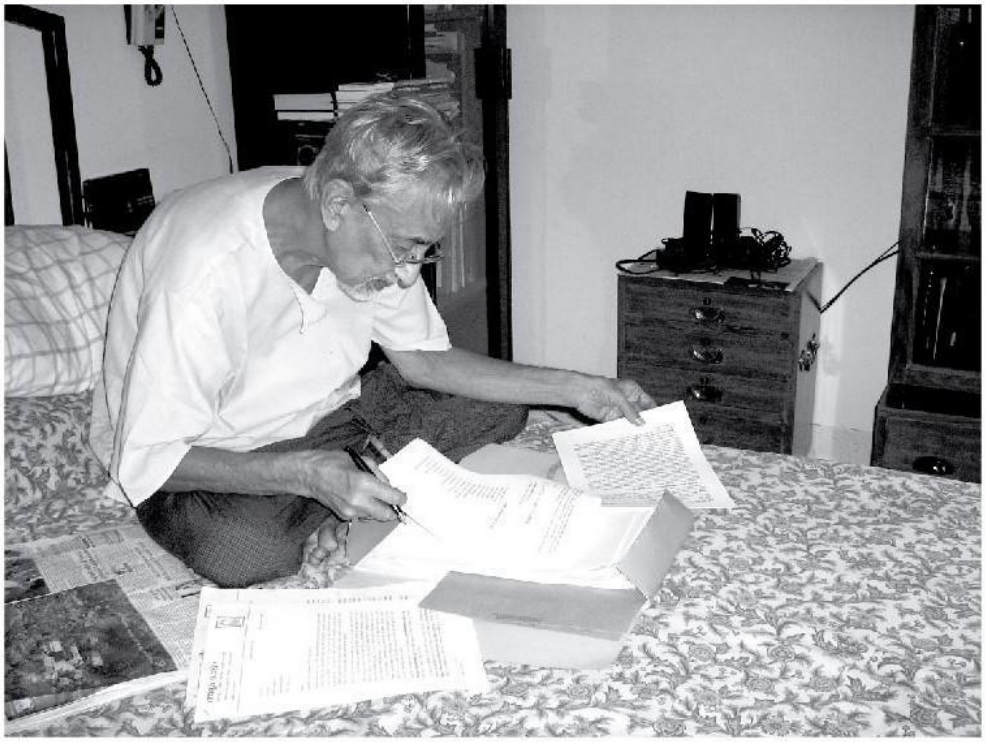

মাননীয় এমামুয্যামান ২০০৮ সনে জঙ্গিবাদ দমনে সরকারকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তাবনা প্রেরণ করেন।

মাননীয় এমামুয্যামান

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মুঘল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক [illegible] তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন [illegible] স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। এ ব্যাপারে একটি ভুল ইতিহাস চালু আছে, বলা হোয়ে থাকে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল। হায়দার আলী চৌধুরী তার 'পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "স্বাধীন নবাব বোলে যে কথাটি প্রচলিত তা ঐতিহাসিক সত্য নয়! স্বাধীন নবাব কথাটি নাট্যকারদের লেখা। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। নবাব কোনদিন স্বাধীন হয় না (পৃষ্ঠা: ৭৭)"। তাঁর এই কথা অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ নবাব শব্দটি আরবি নায়েবের অন্যতম রূপ। আর নায়েব মানেই শাসকের প্রতিনিধি। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন মুঘল শাসকদের নিয়োজিত সুবেদার। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাংলার শাসনে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজ-উদ-দৌলা নন। সিরাজ-উদ-দৌলা তার পূর্বসূরী নবাব আলীবর্দী খানসহ সবাই ছিলেন তৎকালীন দিল্লির মসনদে আসীন মুঘল সম্রাটদের অনুগত প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন শাসক এবং স্বাধীনতা গত হয় আরো অনেক আগে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সত্যিকার ইতিহাস জানতে ফিরে যেতে হবে আরো পেছনে।

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নীর পরাজয় এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মূলতঃ বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে 'স্বাধীন' শাসকের অবসান ঘটে। সুতরাং ১৭৫৭ সালের ২৩ ই জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নন, ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান পন্নীর অবসানের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর শুধু পন্নী বংশই নয়, কোন

শাসকই আর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন কোরতে সক্ষম হন নি। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমাণ্ডার ও জমিদারগণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য তারাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার কোরতে বাধ্য হন। মুঘল সুবেদার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পতনের পর ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চোলে যায়।

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত, বিশেষ করে মোসলেম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হোলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হোয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হোয়েছিল এমামুয্যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত করে ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন যা বর্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল [illegible]াতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু [illegible]নের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছিল যথা- মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে। আন্দোলনটি অনন্য শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল এবং ব্রিটিশ

খাকসার আন্দোলনের ইউনিফর্মে এমামুয্যামান

শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের *(Special Assignment)* জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যামানের বয়স ছিলো মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী 'খাকসার' আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার পর আন্দোলনের এসলামপ্রিয় নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা চান আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হোয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং করটিয়াতে এমামুয্যামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু এমামুয্যামান আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হোতে চান না। এরপর বেশ কয়েকবছর তিনি রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। তাই যখনই সময় সুযোগ পেতেন বেরিয়ে পড়তেন শিকারে। রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর

খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন।

এভাবে এক যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।

মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র চাচাতো ভাই জনাব খুর্‌রম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোলে উক্ত আসনটি শূন্য হোয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্‌যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হোয়ে যায়।

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল অ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (Constituency) পরিবর্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হোতে পারেন নি। এরপর থেকে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

বর্তমানে যারা এদেশের মানুষের ভোট নিয়ে সংসদে যাচ্ছেন বা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমরা প্রায়ই দেখি যে, তারা ভোটের সময় মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ মিনতি করে ভোটভিক্ষা করেন কিন্তু জয়লাভ করার পর নিজেদের যাবতীয় ওয়াদা বেমালুম ভুলে যান। এজন্য পরবর্তী নির্বাচনের আগে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না। তারা এলাকার উন্নয়ন কাজ অথবা আইন প্রণয়ন কোনভাবেই জনগণের সেবা করেন না, নিজেদের স্বার্থ হাসিল কোরতেই তৎপর থাকেন। এ কারণে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে গেলে জনগণও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন কি অনেক সময় অপমানিত হন। অথচ মাননীয় এমামুয্‌যামান যখন রাজনীতিতে ছিলেন তখন এই অঙ্গন আজকের মতন এতটা মিথ্যাচারে পূর্ণ ছিল না। তারমধ্যেও মাননীয় এমামুয্‌যামান ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর অসমান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদাপূরণ, নিঃস্বার্থ জনকল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণে আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হোয়েও তিনি অনেক প্রবীণ ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকবৃন্দের সমীহ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ

এম.পি নির্বাচিত হওয়ার পর মাননীয় এমামুয্‌যামান

উপকৃত হোচ্ছেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও বিহারীদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়। দাঙ্গায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছিল এবং অবাধে চলছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। দাঙ্গায় গৃহহীন হোয়ে পড়ে শত শত মানুষ। মানুষের সরকারবিরোধী মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এসময় আইয়ুব সরকার এই দাঙ্গাকে আরও উৎসাহিত করে। কিন্তু মাননীয় এমামুয্যামান একজন এম.পি. হোয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে মানবতার কল্যাণে ঢাকার দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পাশপাশি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন।

১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

এমামুয্যামান ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। এই একই ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন জাতীয় কবি নজরুলও। মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং এর ট্রাস্টি বোর্ডের আজীবন সদস্য।

প্রকৃত এসলামের জ্ঞান লাভ

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে *(Super power)* সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত করে ফেলল, তাও আলাদা আলাদা ভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই পরশপাথর হোচ্ছে প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হোলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দী পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার এসলামের সাথে বর্তমানে এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হোচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রচলিত এসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হোয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি এসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হোয়ে গেল, তখন তিনি কয়েকটি বই লিখে এই মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হোচ্ছে তওহীদ, এটাই এই দীনের ভিত্তি। সংক্ষেপে এর মর্মার্থ হোচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। বর্তমান দুনিয়ার কোথাও এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হোচ্ছে, কিন্তু এলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে। তওহীদে না থাকার কারণে এই মোসলেম নামক জনসংখ্যাসহ সমগ্র মানবজাতি কার্যত মোশরেক ও কাফের হোয়ে আছে। মাননীয় এমামুয্যামান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতিকে এই শেরক ও কুফর থেকে মুক্ত হোয়ে পুনরায় সেই কলেমায়

ফিরে আসার ডাক দিয়েছেন। তিনি আরও বোলেছেন, আমাদের দেশসহ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি চলছে তার নেপথ্য কারণ হোল আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা বাদ দিয়ে মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করা। এই তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করে আমরা শতধাবিচ্ছিন্ন, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত দুর্বল জনসংখ্যায় পরিণত হোয়েছি। এখন আমরা যদি এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চাই তবে সকল বাদ-বিসম্বাদ ভুলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতেই হবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্যই যামানার এমামের আবির্ভাব। তিনি ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর সকল অবতারদেরকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি সালাম পেশ করেছেন। এজন্য তাঁকে বিকৃত এসলামের আলেমদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হোতে হোয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হোয়েছে, তার বাড়িতে আক্রমণ করা হোয়েছে, তার বই পোড়ানো হোয়েছে। কিন্তু তিনি সত্য থেকে এক চুলও নড়েন নি।

তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই করে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরীক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবীযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: তিনি ছিলেন একজ প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩–৬৫)।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

মহান আল্লাহ ২০০৮ সনে এক মো'জেজা (অলৌকিক ঘটনা) ঘোটিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হেযবুত তওহীদ হক, সত্য, হেযবুত তওহীদের এমাম হক, সত্য এবং হেযবুত তওহীদ দিয়েই সমগ্র পৃথিবীতে সত্য জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। (মো'জেজা কী এবং কেন? সেদিন কী কী মোজেজা ঘোটেছিল এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে 'আল্লাহর মোজেজা হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা' বইটি পড়ুন)। ■

যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ ■

কে তুমি পথিক?

রিয়াদুল হাসান

কে তুমি পথিক? হিন্দু আমি।
কে তুমি? মুসলমান।
কে তুমি গেরুয়া বেশ ধোরে যাও,
বৌদ্ধের সন্তান।
আমি বোলি ভুল ভাবছো সবাই
হাজার বছর ধোরে,
এক পিতা মাতা থেকে এক জাতি
এই পৃথিবীর প'রে।

কে তুমি পথিক? গণতান্ত্রিক।
কে তুমি? সাম্যবাদী।
ভুলে যাও সব বাদ মতবাদ
ধর্মের বেসাতি।

হাতে হাত রাখো, বুকে টেনে নাও
সবাই সবার ভাই,
ভেদাভেদ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
এক জাতি হোয়ে যাই।
একই স্রষ্টার সৃষ্টি আমরা
তাঁর কাছে যেতে হবে,
তাঁর বিধানের আশ্রয় নিলে
পৃথিবী শান্ত হবে।